ওঁ

অথ ঋষীন্দ্রজীবন

অর্থাৎ

পূজ্যপাদ শ্রী ১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
মহর্ষি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর
অলৌকিক পবিত্র জীবন-বৃত্তান্ত।

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত
কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত।

মুদ্রাকর—শ্রীরাজকুমার [illegible]
পশুপতি প্রেস,
১০ নং হরীতকী বাগান লেন, কলি

১৩৩১

১ম সংস্করণ
১০০০

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র

ওঁ

অথ ঋষীন্দ্র জীবন

ভূমিকা

কলিকাতা আর্য্য কন্যাপাঠশালার বাঙ্গালা পাঠবিধি নির্দ্ধারণ কালে [illegible] কন্যাগণের পাঠোপযোগী পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী মহাশয়ের জীবনচরিত বঙ্গভাষায় না থাকায়, ও ইতিপূর্ব্বে ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "দয়ানন্দ চরিত"নামক একখানি বঙ্গভাষায় উক্ত মহর্ষির জীবন বৃত্তান্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার সমস্ত মুদ্রিত পুস্তকগুলি একবারে নিঃশেষিত হওয়ায়, ও উক্ত গ্রন্থকার মহাশয়ের অকাল মৃত্যু জন্য উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে না পারায়, উহা বিক্রয়ার্থ আর বাজারে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, উক্ত পুস্তকের ভাষা ও বিষয় সহজবোধ্য না হওয়ায়, উহা তরুণ বয়স্ক বালক বালিকাগণের পক্ষে কঠিন বিধায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকোপযোগী নহে। এজন্য উপরোক্ত কন্যাপাঠশালার প্রবন্ধকারিণী সভার সভ্যগণ আমাকে তরুণ বয়স্ক বালক বালিকাগণের পাঠোপযোগী মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের জীবনী বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করিতে আদেশ করায়, আমি তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে এই জীবনী যাহার নাম "ঋষীন্দ্র জীবন" রাখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। আমি এই পুস্তক তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি যথা—১ম, ২য় ও ৩য়। প্রথমখণ্ডে আমি ঋষির স্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত, যাহাতে তিনি জন্ম হইতে তাঁহার জীবনের কতক ভাগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন ও যাহার ইংরাজী অনুবাদ থিওসফিষ্ট নামক ইংরাজী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, ও তৎপরে পাঞ্জাব প্রদেশের বিখ্যাত আর্য্যসমাজী বৈদিক পণ্ডিত মাষ্টার লালা দুর্গাপ্রসাদ (A Triumph of Truth) নামক ইংরাজী পুস্তকে প্রকাশ করেন, তাহারই আশয়ে এই বঙ্গানুবাদ লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই প্রথম ভাগে যে সকল আবশ্যকীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় কোন বিশেষ কারণ বশতঃ প্রকাশিত

হয় নাই, তাহা টীকা টিপ্পনির ন্যায়, নিম্নটিপ্পনিতে লিখিত হইবে। প্রথম খণ্ডের জীবন বৃত্তান্ত গুলি মহর্ষির স্বরচিত জীবনচরিতের অনুবাদ বিধায়, আমি ঐগুলি উত্তম পুরুষে বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে মহর্ষি স্বরচিত নিজ জীবনের যে সময় পর্য্যন্তের ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন, আমি তৎপরবর্ত্তী আমৃত্যু সমগ্র ঘটনা গুলি বর্ণন করিয়াছি; এজন্য এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রথম পুরুষে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়খণ্ড বা পরিশিষ্টে মহর্ষির জীবনের সমালোচনা ও তৎসহ বিশেষ করিয়া আর্য্যজাতির ও সমগ্র জগতের কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সরল ভাষায় ও সহজগম্য ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। স্বামীজির জীবিতাবস্থায় ভারতবর্ষীয় খ্যাতনামা যে সকল হিন্দু পণ্ডিত, আচার্য্য, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী তথা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বড় বড় মৌলবী মৌলানা মোল্লাদি বিদ্বান ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিখ্যাত পাদরীগণের এবং জৈনাদিধর্ম্মের বিখ্যাত নেতাগণের সহিত যে সকল শাস্ত্রার্থ বা ধর্ম্মবিষয়ক বিচার হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটী বিবরণ মাত্র এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। মোট কথা আমি যাহাতে তরুণবয়স্ক বালক বালিকাগণ সহজে স্বামীজির জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে তদ্বিষয় যথা সাধ্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পরিশেষে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নিকট আমার এই সবিনয় প্রার্থনা, যে তিনি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে উত্তম বুদ্ধি প্রদান করুন ও এরূপ শক্তি আমাতে নিয়োজিত করুন, যদ্দ্বারা আমি সকল মনোরথ হইতে সমর্থ হই। ইত্যোম্

বিনয়াবনতঃ

শ্রীশঙ্করনাথ পণ্ডিত।

প্রার্থনা—ওম্ অসতোমাসদ্গময়, তমসোমাজ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি। শতপথ ব্রাহ্মণ।

হে পরমশুদ্ধ সত্যস্বরূপ পরমাত্মন্! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে অসৎ (মার্গ) অর্থাৎ মন্দবৃত্তি, পাপবুদ্ধি ইত্যাদি অশুভগুণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সদা সন্মার্গে লইয়া যান্ ও আমাকে সদ্বৃত্তি ও ধারণাবতী বুদ্ধিপ্রদান করুন্। অবিদ্যান্ধকার হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া, সর্ব্বপ্রকাশময় সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ, আমার অন্তরে প্রকাশিত করুন্। সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও তাপরূপী মৃত্যু হইতে, অর্থাৎ ত্রিতাপ হইতে আমাকে আত্যন্তিক নিবৃত্ত করাইয়া, আপনার যে অমৃতরূপী মোক্ষপদ, তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক; যাহাতে আমি ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারা ইহলোকে পবিত্র সুখসম্পত্তি ও জ্ঞানলাভ করিয়া বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগ করতঃ, মৃত্যুর পর পরকালে নিঃশ্রেয়সরূপ পরামুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হই, তাহার বিধান করুন্।

অথ ঋষীন্দ্র জীবনং প্রারভ্যতে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় স্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত বিষয় নিম্নলিখিত রূপে বর্ণন করিয়াছেন যথাঃ—আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে আমি যে বাস্তবিক ব্রাহ্মণ (১), অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমরা কিরূপে সত্য বলিয়া জানিব; এজন্য এ বিষয় প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। অতএব আপনার কর্ত্তব্য যে আপনি আপনার ইষ্ট মিত্র ভ্রাতা বন্ধু আদিকে সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে পত্রাদি আনাইয়া দেউন, অথবা অন্য

(১) যাঁহারা যথা নিয়ম চতুর্থাশ্রমী হইয়া সন্যাস গ্রহণ কালে সরস্বতী বা ভারতী আদি উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই সকল সন্যাসীকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব বলিয়া জানা উচিত।

কোন রূপ বিশ্বাস যোগ্য লোকের পরিচিত বলিয়া নিজকে প্রমাণ করুন্। এই রূপে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হওয়ায় আমি নিজ জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।

ভারতের অপরাপর জনপদ অপেক্ষা গুজরাট দেশের প্রতি আমার কিছু বিশেষ মোহ মায়া বা ভালবাসা আছে *। এক্ষণে যদি আমি প্রশ্নকর্ত্তা দিগের ইচ্ছানুসার আমার ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধব গণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করি, অথবা তাঁহাদিগের সহিত পত্র ব্যবহারাদি করি, তবে আমার প্রতি বিশেষ উপাধি ঘটিবে। বলিতে কি, যে সকল উপাধি অর্থাৎ অশান্তি হইতে আমি বহুকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছি, তখন পুনঃ সেই উপাধিগুলি আমার পশ্চাদগামী হইবে, এজন্য আমি তাহাদিগের নিকট হইতে পত্রাদি আনাইবার প্রযত্ন করি নাই। পিতৃগৃহ পরিত্যাগের পর হইতেই আমি নিজ পিতা মাতার নাম ধাম ও পরিচয় বা নিজ কুল পরিচয় বা বাসস্থান, কাহারও নিকট বর্ণন করিতে স্বীকৃত হই নাই, কারণ আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান উক্তবিষয় বর্ণন করিতে নিষেধ করে। যদি আমার কোন সম্বন্ধী আমার প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন, এবং এইরূপ ঘটিলে, হয়ত আমাকে অনিচ্ছা সত্বেও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতে হইবে। সুতরাং, পুনঃ আমাকে ধনাদি গ্রহণ ও স্পর্শ † করিতে বাধ্য হইয়া গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনঃ গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে, পুনরায় পিতা মাতা ও অপরাপর সম্বন্ধীগণের সেবা শুশ্রূষা করা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িবে। এজন্য পাছে পুনঃ মোহ জালে পতিত হইয়া জগতের পরিত্রাণ ও সংস্কার রূপ উত্তম কার্য্যে আমি যে নিজ জীবন অর্পণ করিয়াছি, যাহা আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও যাহার সাধনার্থ আমি নিজ জীবন অকাতরে বলিদান দিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হই নাই ও

* নীতি শাস্ত্রে লেখা আছে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরীয়সী" অর্থাৎ লোকের নিকট মাতা ও জন্মভূমী স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা ভাল বাসার জিনিস; এমন কি স্বামী যিনি বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও, অন্তরের সংস্কার হইতে মাতৃভূমির প্রতি বিশেষ প্রেম ভুলিতে পারেন নাই।

† প্রকৃত সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এমন কি, এই গুলির স্পর্শ পর্য্যন্ত করা নিষেধ।

তজ্জন্য নিজ আয়ুকে মূল্যহীন (১) জানিয়াছি ; অধিকন্তু. যে সাধন জন্য আমি আমার সমগ্র পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও ভোগ্য বস্তুর আহুতি প্রদান করাই আমার যথার্থ মন্তব্য জ্ঞান করিয়াছি, উপরোক্ত কার্য্য করিলেই এই সমস্ত মন্তব্য আমার নষ্ট হইয়া যাইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। যদি আমি এ সময় দেশের যথার্থ উপকার সাধন ও সংস্কারে বিরত হইয়া, সত্য ও বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই আমার দেশবাসীগণ পূর্ব্ববৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারে পতিত থাকিবেন সন্দেহ নাই।

গুজরাট দেশের অন্তর্গত কাঠীওয়াড় প্রান্তীয় ধ্রাঙ্গধরা (দুগন্ধরা) নামক একটি জনপদ (রাজ্য) আছে। তথায় মচ্ছুকাইটা নাম্নী নদীতীরে মৌর্ভি নামক নগরে সন বিক্রমীয় ১৮৮১ শতাব্দীতে আমার (দয়ানন্দ সরস্বতীর) জন্ম হয়। * আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত। যদিচ আমরা সামবেদীয়, তথাপি আমি শুক্ল যজুর্ব্বেদ পাঠ (২) করিয়া ছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অর্থাৎ ১৮৮৫ বিক্রমাব্দে আমি দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা ও পঠন আরম্ভ করি এবং, সেই সময় হইতেই আমার পিতা মহাশয়

(১) যদি কোন দ্রব্য কাহাকেও উৎসর্গ বা দান করা যায়, তবে দান বা উৎসর্গ করণের পর তাহাতে দাতার আর কোন স্বত্ব থাকে না ; এজন্য তখন উক্ত দাতার পক্ষে সে দ্রব্য মূল্যহীন, কারণ তিনি আর তাহার জন্য কোনরূপ মূল্য দাবী করিতে পারেন না।

* যদি চ স্বামীজি সন্ন্যাসী বিধায়, অর্থাৎ সন্ন্যাসীগণ নিজ গৃহস্থ নাম ও পিতার নাম ধাম বর্ণন করেন না, পরন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পণ্ডিত লেখরাম আদি অনেকে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত বাহির করিয়া প্রকাশ করিলে জানা যায়, যে স্বামীজির পূর্ব্ব নাম মূলশঙ্কর ও তাহার পিতার নাম অম্বাশঙ্কর ছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক রামদেব বি, এ মহাশয় স্বামিজীর জন্ম স্থানের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া অনেক স্থান পরিভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে স্বামীজি খাস মার্ভি নগরে জন্ম গ্রহণ না করিয়া, সন্নিকটস্থ টংকারা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। রামদেব এ বিষয় এত অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, যে তাহা অগ্রাহ্য করা যায় না।

(২) প্রত্যেক ব্রাহ্মণই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব মাত্রেই চারি বেদ মধ্যে কোন না কোন বেদ ও তাহার কোন বিশেষ শাখার অন্তর্গত কথিত হন ; অর্থাৎ যিনি যে বেদী তাহার কুল কর্ম্ম উক্ত বেদের কোন বিশেষ শাখার অন্তর্গত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এবং এইরূপ ব্রাহ্মণকেই কোন বিশেষ বেদী ও তাহার বিশেষ শাখার অন্তর্গত বলা যায়।

ও আমার বংশীয় অপরাপর বৃদ্ধগণ আমাকে নিজ কুল ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আমাকে অনেক গুলি স্তোত্র বেদমন্ত্র ও তৎ সম্বন্ধীয় টীকাদি কণ্ঠস্থ করাইলেন;

আমার অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে যজ্ঞোপবীত সংস্কার সম্পাদিত হয়, সেই সময় হইতেই গায়ত্রী ও সন্ধ্যোপাসনার বিধি আমাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। তৎপশ্চাৎ রুদ্রাধ্যায়েরশিক্ষার পর সম্পূর্ণ যজুর্ব্বেদ পাঠ আরম্ভ করি, এবং এই যজুর্ব্বেদ পাঠের শিক্ষকতার কার্য্য আমার পিতা ঠাকুর করিতেন। এই সময় আমার এক কনিষ্ঠা-ভগ্নীর জন্ম হয়। আমাদিগের গৃহের সমস্ত পরিবার মাত্রেই শৈবমতাবলম্বী অর্থাৎ শিবভক্ত ও শিবমন্ত্রোপাসক ছিলেন; এ কারণ তাহাদের সকলেরই এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে,আমিও উক্তমতে উত্তমরূপে প্রবীণ হইয়া অর্থাৎ দৃঢ় বা পাকা শৈব হইয়া যাই। এ কারণ বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহারা আমাকে শৈব সংস্কারাপন্ন করিতে প্রয়াস পান। আমার পিতামহাশয় বিশেষ করিয়া আমাকে দৃঢ় শৈবমতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করিতেন এবং শৈব মতের প্রদোষাদি ব্রত ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেন ও সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন ও আদেশ করিতেন যে তুমি পার্থিব পূজা অর্থাৎ মৃত্তিকার শিবলিঙ্গ স্বহস্তে গঠন করিয়া, মন্ত্র দ্বারা তাহার আবাহন, পূজন ও বিসর্জ্জনাদি কার্য্য অবশ্য প্রতিদিন সম্পাদন করিবে।

আমি দশম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই সাধারণতঃ, পার্থিব শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার পিতামহাশয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে আমি যথা নিয়ম উপবাস করিয়া শিবচতুর্দ্দশী ব্রত পালন পূর্ব্বক যথারীতি শিবপূজা সম্পাদন করতঃ, উক্ত ব্রত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, পাকা শিবোপাসক হইয়া যাই। পরন্তু এই কার্য্যে আমার মাতাঠাকুরাণী সর্ব্বদাই বিরোধ করিতেন ও বাধা দিতেন, ও প্রায়ই বলিতেন, যে আমি তৎকালে (এত তরুণ বয়সে) কোন প্রকারেই উপবাস করিবার উপযুক্ত নহি; এবং এই মতভেদ হেতু প্রায়ই উভয়ের মধ্যে তর্ক, বিতর্ক, বচসা এবং বাদানুবাদ ও কখন ২ কলহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইত। পিতা ঠাকুর মহাশয় ব্যাকরণের কোন ২ বিষয়, ও বেদের পাঠ মাত্র আমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন, ও প্রায়ই দেব মন্দিরে, বিশেষতঃ শিবমন্দিরে ও কোন বিশেষ মেলা বা পর্ব্বে অথবা কোন সাধারণ সভা সমিতি অথবা কোন বিশেষ মিত্রাদির সহিত সাক্ষাৎ কালে, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও প্রায়ই এরূপ উপদেশ

দিতেন, যে অন্যান্য বিবিধ উপাসনার মধ্যে শিবোপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ বাদপ্রতিবাদে ও পঠনাদিতে আমি ত্রয়োদশবৎসর অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমে পাদার্পণ করিলাম।

আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই সমগ্র যজুর্ব্বেদ সংহিতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। শব্দরূপাবলী প্রভৃতি ব্যাকরণের কোন কোন অংশ ইতি মধ্যেই আমি সমাপ্ত করি। যে যে স্থানে শিব পুরাণাদির কথা হইত, আমার পিতা মহাশয় প্রায়ই আমাকে তথায় সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও নিজ সমীপে বসাইয়া উক্ত কথা আমাকে শ্রবণ করাইতেন। আমার পিতার নিজ গৃহে কুসীদ-ব্যবসা ছিল অর্থাৎ টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার সুদ লইবার ব্যবসা বা ব্যবহার ছিল। ব্রাহ্মণ হইলেও আমার পিতার ভিক্ষাবৃত্তি বা যজমানী পেশা ছিল না; অধিকন্তু তাহার জমীদারী বা ভূসম্পত্তি ছিল, যাহার আয় হইতে আমাদিগের গৃহে সকলেরই স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। পুরুষ পরম্পরায় আমার পিতা মহাশয় জমাদার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই পদ সংযুক্ত-প্রান্তে সরকারী তহশীল্‌দারী পদের সদৃশ পদ ছিল; বঙ্গদেশে ইহা খাস্‌-মহলের রেভিনিউ-ডিপুটী কালেক্টারের পদস্বরূপ। এই কার্য্যে আমার পিতা মহাশয়কে রাজকর তহশীল করিতে হইত এবং তজ্জন্য তাঁহার অধীনস্থ সরকারী আরদলী ও সিপাহী সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিত।

আমার পিতা এই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমেই আমাকে শিবরাত্রি ব্রত পালন করিবার আদেশ দেন। পরন্তু আমি তাহা করিতে উদ্যত না হওয়ায়, তিনি আমাকে শিবচতুর্দ্দশী ব্রত মাহাত্ম্যের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন এবং ঐ ব্রত কথা শুনিয়া আমার উহা বিশেষ প্রীতিকর বোধ হইল। আমি তখন উক্ত ব্রতানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। যদিচ আমার মাতাঠাকুরাণী বলিতেন যে "তুই উপবাস করিস্‌ না, কারণ তুই ক্ষুধা সম্বরণ ক'র্‌তে পার্‌বি না, বিশেষতঃ তুই অতি প্রাতেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কিছু না কিছু আহার ক'রিস্‌, এ কারণ কদাপি তুই উপবাস সহ্য করিতে পার্‌বি না"। বিশেষ করিয়া আমার মাতা উপবাস জন্য পিত্ত পড়িয়া পাছে আমার কোনরূপ রোগ জন্মে, এই আশঙ্কাতেও উপবাস করিতে নিষেধ করিতেন। যাহা হউক পিতাঠাকুর এ সমস্ত কথা বা বিচার গ্রাহ্য করিতেন না, তিনি সর্ব্বদাই জেদ করিয়া বলিতেন, যে শিবরাত্রি ব্রত যখন আমাদিগের

কুল-পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে ও কুলধর্ম্ম, তথন আমার পক্ষে উক্ত ব্রত সম্পন্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য; এজন্য উহা আমাকে অবশ্য করিতেই হইবে। পরিশেষে পিতা মহাশয় মাতাঠাকুরাণীর সমস্ত প্রতিবাদ ও বিচারাদি অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে শিবরাত্রি ব্রতোপবাস জন্য কঠোর আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

যাহা হউক শীঘ্রই সেই মহান্ কষ্টকর শিবরাত্রি উপবাস দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঠিওয়াড় দেশে এই ব্রত মাঘমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতেই সংযমাদির সহিত সম্পাদিত হয় এবং ইহা এইরূপ পরম্পরা চলিত আছে; এ কারণ আমার পিতা ত্রয়োদশীতেই আমাকে শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া পর দিবস ব্রত ধারণ নিশ্চয় করাইয়া দিলেন। যদিচ মাতাঠাকুরাণী পিতৃদেবকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে আমি কোন মতেই উক্ত কঠোর শিবচতুর্দ্দশী ব্রত পালন করিতে পারিব না, তথাপি পিতা মহাশয় তাহাতে কিছুমাত্র ধ্যান না দিয়া আমাকে ঐ ব্রত পালন আরম্ভ করাইয়া দিলেন। উক্ত শিবরাত্রি ব্রত দিবসের সায়ংকালের কিছু পূর্ব্বেই আমাকে পিতা মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে সেই দিবস রাত্রিতেই আমাকে শিবব্রত পূজার নিয়মগুলি শিক্ষা করিতে হইবে, এবং শিব-মন্দিরে সমস্ত রাত্রি জাগরণ জন্য আমাকে তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে।

মার্ভি নগরের বহির্দ্দিকে একটি প্রকাণ্ড শিব-মন্দির আছে, এবং উক্ত শিবালয়ে শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে বহু ব্রতধারীগণের সমাগম হয়। তাঁহারা তথায় গিয়া শিবপূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক দর্শকগণও তথায় উপস্থিত হন। আমি, আমার পিতা মহাশয় ও অন্যান্য বহু লোক, সে দিবস উক্ত মন্দিরে যথা সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রথম প্রহরের পূজার পর দ্বিতীয় প্রহরের পূজাও পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইল। পরন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হইতে সমাগত লোক সকল নিদ্রার উদ্রেকে ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন, ও শনৈঃ শনৈঃ সকলেই শুইয়া পড়িলেন। আমি পাছে এই কষ্টকর উপবাস নিষ্ফল হইয়া যায় এই আশঙ্কায় জাগরিত ছিলাম, কারণ ব্রত কথায় শুনিয়া ছিলাম যে উক্ত দিবস নিদ্রিত হইলে ব্রতফল নষ্ট হইয়া যায়, এ কারণ বার বার চক্ষে জলের ছিটা দিয়া নিদ্রা নিবারণ করতঃ জাগরিত ছিলাম!

যাহা হউক, আমার পিতার সৌভাগ্য (১) আমাপেক্ষা অনেক কম ছিল, কারণ তিনি সমস্ত দিবসের শ্রম ও উপবাস জন্য ক্লান্তি সহন করিতে না পারিয়া, সকলের পূর্ব্বেই নিদ্রাভিভূত হইয়া শুইয়া পড়িলেন; কাজেই সমস্ত রাত্রি জাগরণের ভার, বস্তুতঃ একমাত্র আমার প্রতিই অর্পিত হইল। মন্দিরের পূজারিগণও বাহিরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ সকলে ঘুমাইয়া যাইবার পর, মন্দির মধ্যে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল; অর্থাৎ একটি ইন্দুর তাহার গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া, পিণ্ডাদি প্রসাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, শিবলিঙ্গের মস্তকে যে আতপ তণ্ডুল, মিষ্টান্ন ও বিল্বপত্রাদি অর্পিত ছিল, তাহা খাইবার লালসায়, উক্ত শিব-মূর্ত্তির মস্তকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া, শিব-মস্তকোপরি অর্পিত দ্রব্যগুলি আনন্দে খাইতে লাগিল। আমি জাগরিত থাকায় ঐ ইন্দুরের সমস্ত লীলা দেখিতে লাগিলাম ও সে সময় আমার বাল্য-মনে এক বিচিত্র ভাব ও বিবিধ প্রকার বিচার উপস্থিত হইল। আমি মনে মনে এরূপ ভাবিতে লাগিলাম ও শঙ্কা করিলাম যে, আমি যে মহাদেবের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য ব্রত-কথায় শুনিয়াছি, তিনিই কি এই মহাদেব? অথবা ইনি অন্য কোন মহাদেব? কারণ যে মহাদেবের বিবরণ ব্রতাদি কথায় শুনিয়াছিলাম, তিনি একজন মনুষ্যের ন্যায় জীবিত বা চেতন দেবতা, যাঁহার বিকরালগুণ (প্রচণ্ড স্বভাব), পাশুপতাস্ত্র বৃষভবাহন ও হস্তে ত্রিশূল ধারণ। যিনি ডমরুবাদ্য বাজাইয়া থাকেন ও লোককে ক্রোধের বশে শাপ দেন এবং পূজা ও সেবাদি পাইলে অথবা তাঁহার স্তোত্রাদি পাঠ করিলে, তিনি আশু তুষ্ট হইয়া ভক্তকে বর প্রদান করেন। যিনি কৈলাসশিখরবাসী ও তথাকার স্বামী, ইত্যাদি প্রকার যে মহাদেবের কথা ও বিবরণ আমি ব্রত কথায় শুনিয়াছি, সেই পরব্রহ্মই যে

(১) এখানে সৌভাগ্য কথাটি স্বামীজি কিছু শ্লেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন, কারণ তিনি যখন এই বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তখন যদিচ তিনি শিবরাত্রি জাগরণের ফল মানিতেন না, পরন্তু তাহার পিতা উহার ফল মানিতেন। এজন্য তাঁহার পিতা নিদ্রিত হওয়ায়, উক্ত ব্রত ফলে বঞ্চিত হইলেন এবং স্বামীজি জাগ্রত থাকা বিধায়, তাঁহার পিতার বিশ্বাস মতে তিনি ঐ ব্রত ফলে বঞ্চিত হইলেন না; এ কারণ তিনি তাঁহার পিতা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান্।

ইনি, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু ইহার মস্তকোপরি একটি নগণ্য ক্ষুদ্র ইন্দুর অবলীলাক্রমে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে? যাহা হউক, এই মূষিকের ব্যাপার দেখিয়া আমার বাল-বুদ্ধিতে এরূপ ভাব প্রতীত হইল যে, যে মহাপরাক্রান্ত শিব বা রুদ্র, নিজ পাশুপতাদি অস্ত্র দ্বারা বড় বড় মহান্ প্রতাপী দুষ্ট স্বভাবযুক্ত দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছেন, তাঁহার কি একটা সামান্য মূষিককে তাড়াইয়া দিবার শক্তি নাই?

এইরূপ বহুবিধ তর্ক বিতর্ক আমার মনে উদিত হইতে লাগিল এবং আমি এরূপ বিচার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনে ধারণ করিতে পারিলাম না ও কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতেও অসমর্থ হইলাম। শেষে অনন্যোপায় হইয়া পিতা মহাশয়কে জাগাইতে বাধ্য হইলাম ও তৎপরে তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে প্রশ্ন করিয়া প্রার্থনা করিলাম যে, তিনি যেন আমার এই মনের ভ্রমকে সত্যোপদেশ দ্বারা দূরীকৃত করেন।

আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই মন্দিরে মহাদেবের যে ভয়ানক মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, তাহা কি উক্ত ব্রত কথানুরূপী মহাদেব, যাঁহাকে পুরাণে পরব্রহ্মরূপে বর্ণন করা হইয়াছে, অথবা ইহা তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি বা সমাকৃতি, কিম্বা ইহা অন্য কোন বস্তু বা অন্য কোন মহাদেব? আমার মুখ-প্রসূত এরূপ প্রশ্ন শুনিবা মাত্রই, আমার পিতা মহাশয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বলিলেন "তোর একথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি?" "তুই এরূপ প্রশ্ন কিজন্য করিতেছিস্?" তখন আমি উত্তর দিলাম যে, ব্রত কথায় আমি যে মহাদেবের বিবরণ শুনিয়াছি তিনি সচেতন সর্ব্বশক্তিমান মহাদেব, অথচ এই মহাদেবের মূর্ত্তির উপর একটা সামান্য মূষিক লাফাইয়া বেড়াইতেছে ও তাহার মস্তকে উঠিয়া অক্ষতাদি আহার ও মলমূত্রাদি ত্যাগ পূর্ব্বক মূর্ত্তিকে অপবিত্র ও ভ্রষ্ট করিতেছে। অতএব কিজন্য মহাদেব এই ক্ষুদ্র মূষিকের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতেছেন না? ও কি জন্যই বা ইহাকে নিজ পরম পবিত্র অঙ্গের উপর এরূপে বিচরণাদি করিতে দিতেছেন; এমন কি ইনি নিজ মস্তক পর্য্যন্ত নাড়িতেছেন না? ইত্যাদি কারণ জন্য আমি কোন মতেই এই মহাদেবের মূর্ত্তিকে, সেই সর্ব্বশক্তিমান চেতন পরমেশ্বর বলিয়া বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ও ইহা কোন মতেই সম্ভব পর বিবেচনা হইতেছে না যে, ইনিই সেই মহাদেব। অতএব এ বিষয়ের সত্য সিদ্ধান্ত

কি ? তাহা আপনার নিকট জানিতে চাহি ; আপনি কৃপা করিয়া আমার মনের সন্দেহ দূর করিয়া দেউন। আমার পিতাঠাকুর আমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমাকে অতি যত্নসহকারে বুঝাইতে লাগিলেন, যে কৈলাস পর্ব্বতোপরি যে মহাদেব বাস করেন, লোকে তাঁহারই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, মন্ত্রদ্বারা আবাহন-পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন। এই কলিযুগে (১) উক্ত কৈলাসবাসী মহাদেবের সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ দর্শন) হয় না, এজন্য পাষাণাদির মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এবং ঐ মূর্ত্তিতে মনে মনে মহাদেব ভাবনা অর্থাৎ মহাদেবের আবির্ভাব হইয়াছে এরূপ ভাবনা করিয়া পূজা করিলে, কৈলাসনাথ মহাদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন, ও তখন সাধকের মনে এরূপ ভাব উপস্থিত হয় ও তাহার বোধ হয়, যেন স্বয়ং মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ও তাঁহারই পূজা হইতেছে, এবং তিনিও যেন উক্ত পূজা গ্রহণ করিতেছেন। যাহা হউক, তোর তর্ক বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মহান্। তুমি যাহা দেখিতেছ, তাহা কেবল দেবতার মূর্ত্তি মাত্র। এইরূপ পিতা মহাশয়ের উপদেশে, আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায়, সন্তোষ জন্মিল না। প্রত্যুত তাঁহার কথায় আমার মনে আরও অধিক ভ্রম উপস্থিত হইল ও বোধ হইল, এ বিষয়ে অবশ্যই কিছু গণ্ডগোল আছে। বলিতে কি, পিতা মহাশয়ের কথায় আমার মনের শঙ্কা আরও দৃঢ়ীভূত হইল ও আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, যে পিতা মহাশয় স্বয়ং এ বিষয়ের যথাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই, ও আমাকে হ য ব র ল (১) করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন মাত্র।

তৎপরে আমি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, যে যাবৎ আমি উক্ত মহাদেবকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ দর্শন না করিব, তাবৎ কখনই তাঁহার পূজা করিব না, ও ইহার অন্যথা হইবে না। যাহা হউক এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরে বাল্যাবস্থা বশতঃ আমার অত্যন্ত ক্ষুধা ও শ্রান্তি বোধ হওয়ায়, আমি নিজকে দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলাম, এবং তখন পিতা মহাশয়কে বলিলাম, যে আমি এখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতে চাহি। পিতা মহাশয় বলিলেন, "এই সিপাইকে সঙ্গে লইয়া গৃহে যাও, পরন্তু খবরদার, তথায় যেন কিছু আহার করিও না।"

---

(১) কলিযুগের লোকেরা পাপী বলিয়া, তাহারা দেবতাগণের সাক্ষাৎ দর্শন পায় না, ইহাই সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস।

(১) "হ য ব র ল" যদিচ ব্যাকরণের সূত্র, পরন্তু বাঙ্গালা ভাষায় গোজামিলন দেওয়াকে "হ য ব র ল" বলা যায়, অর্থাৎ যাহাতে গণ্ডগোল আছে।

আমি শিবমন্দির হইতে বাটী পৌঁছিবামাত্রই মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম, "আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে"। মাতা বলিলেন "আমি তোকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, তুই উপবাস সহ্য কত্তে পারবি না, তবু তো তুই আমার কথা না শুনে হঠ (জেদ্) করে, উপবাস ক'ত্তে গেলি"।

এই কথা বলিয়া মাতাঠাকুরাণী আমাকে মেঠাই খাইতে দিলেন ও বলিলেন যে "তুই তোর পিতার নিকট যাস্ না, আর এই মিঠাই খাবার কথা বলিস্না, নচেৎ মার খাবি।" আহার করিবার পর রাত্রি ১টা বাজিয়া গেলে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম ও পর দিবস প্রাতে আটটার পর আমার ঘুম ভাঙ্গিল। 'পিতা মহাশয় প্রাতঃকালে বাড়ী আসিয়া আমার রাত্রিকালীন ভোজন বিষয় শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।" তখন আমি উত্তরে পিতামহাশয়কে বলিলাম যে "মন্দিরের শিব মূর্ত্তি, ব্রত কথার আসল মহাদেব নহেন; এজন্য ঐ নকলী মহাদেবের কি জন্য পূজা করিব।" বস্তুতঃ, আমার মন হইতে মন্দিরের মূর্ত্তিমান্ মহাদেবের প্রতি শ্রদ্ধা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে আমি আমার খুল্লতাত (খুড়া) মহাশয়কে বলিলাম যে, আমাকে অধ্যয়ন করিতে হয়, এজন্য আমার দ্বারা আর পূজা উপবাসাদি হইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া আমার খুড়া মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী উভয়ে মিলিয়া পিতা মহাশয়কে সান্ত্বনা করতঃ, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি যেন আমাকে পড়িতে অবকাশ দেন ও ব্রতাদি জন্য বিশেষ জেদ বা জোর না করেন; কারণ এরূপ করিলে আমার পাঠে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। পিতা মহাশয় অগত্যা রাজী হইলেন এবং তখন হইতে আমি নিজ অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইলাম ও অতি অল্প সময় মধ্যে নিজ অধ্যয়নে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সময় আমি নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে ইচ্ছুক হইয়া, জনৈক পণ্ডিতের নিকট ঐ সমস্ত শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করিয়া দিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে লাগিলাম ও এই সমস্ত গ্রন্থের সহিত কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় অপর পুস্তকও পাঠ করিতাম। তৎকালে আমার সমস্ত সময়ই অধ্যয়নে ব্যতীত হইত।

আমার জন্মের পর আমার একটী কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম হয়, তৎপর একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্মে; ভ্রাতার পর আর একটী ভগিনী এবং ঐ ভগিনীর পর আর একটী

ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়, অর্থাৎ আমার জন্মের পর আমার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা ও দুইটী কনিষ্ঠা সহোদরা ভগ্নীর জন্ম হয়। এ সময় আমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল।

সন ১৮৯৬ বিক্রমাব্দে, যখন আমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষমাত্র, তখন আমার প্রথম কনিষ্ঠা ভগ্নীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র ছিল। এই সময় আমার উক্ত ভগ্নী হঠাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হন। উক্ত ঘটনা এইরূপে ঘটে; একদিন রাত্রিকালে আমি আমাদিগের এক মিত্র-ভবনে নৃত্যোৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম, এমন সময় সহসা গৃহ হইতে এক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, যে আমার প্রথম কনিষ্ঠা ভগ্নী বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। সংবাদ পাইবা মাত্রই আমরা সকলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। বৈদ্যকে ডাকা হইল ও চিকিৎসা হইতে লাগিল। পরন্তু তাহাতে কোন উপশম না হইয়া, চারি ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। আমি তৎকালে আমার প্রিয়তমা ভগ্নীর মৃত শয্যার পার্শ্বে, গৃহের দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

আমি ইতঃ পূর্ব্বে ইহ জীবনে কখন কাহারও মৃত্যু ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি নাই, অথবা কখন কোন লোককেও মৃত্যু যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখি নাই,কিম্বা কাহার মরণের বিভীষিকা মূর্ত্তিও দর্শন করি নাই। ফলতঃ,আমার পরম স্নেহের সহোদরার আসন্ন মৃত্যু-দশা দর্শনে,আমার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত উপস্থিত হইল, ও আমি অত্যন্ত ভয়ভীত হইলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,যে মনুষ্যমাত্রকেই এই ভীষণ মৃত্যুমুখে একদিন না একদিন পতিত হইতেই হইবে ও আমারও দশা, কোন না কোন দিন, অবশ্যই ঠিক এইরূপ ঘটিবে। আমি আরও মনে মনে বিচার করিতে লাগিলাম, যখন সংসারের সমগ্র জীব মাত্রেরই একদিন এইরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী ও কাহারও যখন ইহা হইতে পরিত্রাণ নাই, (১) তখন জীবের এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য,যাহাতে

(১) বারংবার জন্ম মরণ ঘটিলেই তাপ বা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে; কারণ শরীর পরিগ্রহ বা জন্ম গ্রহণ করিলেই,দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যোগাদি দ্বারা জ্ঞানীজন এই বারংবার জন্ম মরণরূপ গতায়াত নষ্ট করিয়া, পরামুক্তি লাভ করতঃ মৃত্যুঞ্জয় হইতে সমর্থ হন; অর্থাৎ তখন তাঁহারা মুক্তির আনন্দ উপভোগ করেন ও আর তাঁহাদিগকে উক্ত রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মরণরূপী তাপ হইতে ত্রাণ পাইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে সমর্থ হওয়া যায় এবং সেই সময় হইতেই আমার চিত্তে বৈরাগ্য ভাব দৃঢ়ীভূত হইল।

এই হৃদয়-বিদীর্ণ ঘটনায় পরিবারস্থ সকলেই বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন; পরন্তু আমি এই অদৃষ্ট পূর্ব্বক ঘটনা দেখিয়া, ভয় ও ভাবনায় বিহ্বল হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাজেই আমার চক্ষু হইতে অপরের ন্যায় অশ্রুপাত হইল না। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার পিতা আমাকে পাষাণ হৃদয় বলিয়া অভিহিত করিলেন। আমার মাতা ঠাকুরাণী, যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি পর্য্যন্ত আমার প্রতি ঐরূপ কঠোর শব্দ প্রয়োগ করিতে ক্রটি করেন নাই। ফলতঃ, তাঁহারা উভয়েই আমার মনের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই।

পরে তাঁহারা আমাকে শুইতে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আমি শয্যায় গিয়া নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই আমার নিদ্রা আসিল না। অনেক চেষ্টা করিলাম, পরন্তু এরূপ মনের অশান্তিতে নিদ্রা কিরূপে আসিতে পারে। শয্যায় শুইয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতে লাগিলাম ও সমস্ত রাত্রি গভীর চিন্তা-তরঙ্গে ভাসমান ছিলাম। আমাদিগের দেশে এক অদ্ভুত নিয়ম প্রচলিত আছে, যে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু ঘটিবার পর, কোন নিকট সম্বন্ধায় পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে ধরিয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে হয়, এবং অনেক সময় উভয়েই ক্রন্দন করেন; পরন্তু আমি এরূপ দেশরীতি অনুসারে ৩। ৪ বার লোক দেখান শোক প্রকাশ করি নাই বলিয়া, আমি আত্মীয় পরিজনের নিকট নিন্দার পাত্র হইয়াছিলাম। এমন কি, তাঁহারা আমাকে এজন্য ধিক্কার পর্য্যন্ত দিতেও ক্রটি করেন নাই।

যে সময় আত্মীয় ও কুটুম্বগণ রোদন করিতেছিলেন, তখন আমি জড় মূর্ত্তি বা স্থাণুর ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। সে সময় মনুষ্য মাত্রেরই জীবন যে অনিত্য ও নিরর্থক, তাহা আমার মনে উদিত হইতে লাগিল, ও মনে মনে নানা প্রকার সংকল্প বিকল্প, অতীব শোক সহ উৎপন্ন হইতে লাগিল। তখন আমি বেশ বুঝিলাম, যে সংসারে এরূপ কেহই নাই, যিনি এই নির্দ্দয় মৃত্যুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। নিশ্চয়ই একদিন সকলকেই মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে; কারণ শরীর ধারণ করিলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এজন্য উক্ত মৃত্যু

ও মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইবার ঔষধ বা উপায় কোথা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, ও কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই বা অমরত্ব লাভ করা যায়, তাহার অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিলাম। ফল কথা, তখন আমি বিচার করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম, যেরূপে পারি, মুক্তি-রূপী-অমৃত হস্তগত করিয়া, আমাকে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতেই হইবে। বলিতে কি, সে সময় হইতে আমার মন, ঐহিক সুখ বাসনা হইতে একেবারে বিরত হইয়া গেল, ও কেবল পরমাত্ম সম্বন্ধীয় উত্তম বিষয়ক বিচারেই মন সংযুক্ত রহিল। যাহা হউক, এইরূপ বিচার আমি মনে মনেই করিতে লাগিলাম। ইহা কাহার নিকট প্রকাশ করিলাম না; এবং যথাপূর্ব্ব পঠনাদিতেই মন সন্নিবেশ করিয়া রহিলাম।

আমি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে, অর্থাৎ সন ১৮৯৯ বিক্রমাব্দে, আমার পূজনীয় খুল্লতাত, যিনি একজন সদ্‌গুণযুক্ত ধার্ম্মিক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন ও যিনি আমাকে অত্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, তিনিও বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি আমাকে নিজ সমীপে ডাকিলেন। তখন তাহার নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতে ছিল ও লোকে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলাম। আমার দিকে দৃষ্টি পড়িবা মাত্রই, তাঁহার অশ্রুপাত হইতে লাগিল; তখন আমি আর নিজকে সামলাইতে না পারিয়া, ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম ও চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অতিমাত্র ক্রন্দনে আমার চক্ষুদ্বয় স্ফীত হইয়া গেল। এরূপ ক্রন্দন ও চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পতন আমার জীবনে ইতঃপূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। তখন আমার মনে স্পষ্ট প্রতীত হইল, যে আমার খুড়া মহাশয়ের ন্যায় আমাকেও একদিন অবশ্যই মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। তৎ পশ্চাৎ আমার মনে এরূপ বৈরাগ্য ভাব উদয় হইল, যে এ সংসার ছার, ইহাতে কিছুই প্রকৃত স্থায়ী বস্তু নাই। আমি তখন পর্য্যন্ত আমার মনের প্রকৃত আন্তরিক ভাব, পিতা মাতার নিকট প্রকাশ করি নাই; তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায়, এ বিষয় আত্মীয়, বান্ধব পণ্ডিত ও বিদ্বান দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা সকলেই আমাকে যোগাভ্যাসই যে একমাত্র অমৃতত্ব লাভের উপায়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন, ও যোগাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলেন। সুতরাং তখন আমি গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র

গমনে কৃত সংকল্প হইলাম। নিজ মিত্রগণের নিকট বলিতে লাগিলাম, আমার আর গৃহাশ্রম ভাল লাগিতেছে না। কারণ আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান (দৃঢ় বিশ্বাস) জন্মিয়াছে, যে এই অসার সংসারে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার প্রাপ্তির জন্য আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতে পারি; অথবা যাহার জন্য আমাদের মন এই সাংসারিক বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে। এই সমস্ত কথা ও আমার আন্তরিক মনোভাব, লোকে আমার পিতা মাতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন তাঁহারা আমাকে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য কৃত সংকল্প হইলেন, ও যাহাতে আমার বিবাহ সংস্কার (কার্য্য) শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় আমার বয়স বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। আমার পিতা মাতা উভয়েরই এইরূপ বিচার হইল, যে এই বিংশতি বর্ষ বয়সেই আমার বিবাহ কার্য্য নিশ্চয় সম্পন্ন করিবেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে, আমি আমার আত্মীয় বন্ধুগণ দ্বারা পিতা মহাশয়কে অনুরোধ করাইলাম, তিনি যেন আমার বিবাহ কিছুকাল জন্য স্থগিত রাখেন, কারণ আমি এখন কোন মতেই বিবাহ করিব না; কিন্তু তাঁহারা, অর্থাৎ পিতা মাতা উভয়েই, বিবাহ স্থগিত রাখিতে রাজী হইলেন না। এইরূপ করিতে করিতে আমার বয়স বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইয়া গেল।

বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে পর, আমি পিতা মহাশয়কে বলিলাম, যে আমি কাশীধামে গিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র, ব্যাকরণ ও বৈদ্যক গ্রন্থ সকলের পাঠ সমাপ্তি করিব। এ কথায় আমার পিতা, মাতা ও কুটুম্বগণ সকলে একমতে উত্তর দিলেন, যে আমাকে কোন মতেই কাশী পাঠান হইবে না। যাহা কিছু পাঠ করিতে হয়, ঘরে থাকিয়া পাঠ কর। তাঁহারা আরও বলিলেন, যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহাই কি কম হইয়াছে, এখন তোমার বিবাহের অতি অল্প দিনই বাকি আছে, অর্থাৎ আগামী বর্ষে তোমার বিবাহ দিতেই হইবে, কারণ কন্যা-কর্ত্তাগণ আর কোন মতে বিলম্ব করিতে প্রস্তুত নহেন; কারণ তাঁহাদের কন্যা অরক্ষণীয়া* হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলিলেন, তোমার আর

* আমাদিগের দেশে আধুনিক পণ্ডিতেরা, পরাশর আদি শাস্ত্রকারগণের নাম দিয়া, মুসলমান দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, অষ্টমবৎসর হইতে দশম বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ কাল নির্দ্ধারণ করেন; যাহা অতিক্রম করিলে কন্যার পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু ও ভ্রাতা-গণকে নরকগামী হইতে হয় এরূপ ভয় প্রদর্শনও করেন। অবশ্য ইহা অবৈদিক মত, পরন্তু অবিদ্যা বশতঃ, আমরা এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া কন্যাগণকে অতি শৈশবাবস্থাতেই বিবাহ দিয়া থাকি। এই শৈশব বিবাহের পরিণাম যে অত্যন্ত মন্দ ও ইহা আর্য্যাবর্ত্তের মহান্ অবনতির কারণ, তাহা শিক্ষক মহাশয় যেন বুঝাইয়া দেন।

অধিক পঠন পাঠনের প্রয়োজন কি? যাহা শিখিয়াছ যথেষ্ট হইয়াছে। মাতা ঠাকুরাণী আরও বলিলেন, আমি বেশ জানি, অত্যন্ত অধিক লেখাপড়া শিখিলে লোকে বিবাহ করা অনুচিত বিবেচনা করে; বিশেষতঃ, কাশীতে তোমাকে পাঠাইলে তোমার বিবাহ সম্পন্ন বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটিবে। যাহা হউক, আমি পুনঃ পিতার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিলাম যে, আমাকে কৃপা করিয়া অবশ্য পাঠ জন্য কাশীধামে পাঠাইয়া দেউন, কারণ যাবৎ আমি তথা হইতে পূর্ণ বিদ্বান হইয়া প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ আমার বিবাহ হওয়া উচিত নহে; এজন্য পাঠার্থ আমাকে অবশ্য কাশী পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, পুনঃ বলিলাম, যাবৎ আমি তথা হইতে পূর্ণ বিদ্বান হইয়া প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ আমার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এইরূপ বার বার প্রার্থনা করায় তাহার ফল অত্যন্ত বিপরীত হইল; কারণ আমার মাতাও তাহাতে জেদ্ করিয়া বসিলেন যে, আমি কোন মতেই তোমাকে (অর্থাৎ আমাকে) কোথাও পাঠাইব না ও যত শীঘ্র পারি তোমার বিবাহ দিবই দিব। সে সময় আমি দেখিলাম যে অধিক কথা কাটাকাটি করিলে কার্য্য ক্ষতি ভিন্ন তাহা উদ্ধার হওয়া অসম্ভব; এজন্য আর কথা না বাড়াইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলাম। আমার পিতা যখন দেখিলেন ও বুঝিতে পারিলেন যে আমার মন বাড়ীতে লাগিতেছে না, তখন তিনি আমাকে নিজ জমীদারী-কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ দিলেন; পরন্তু আমি তাহাও স্বীকার করিলাম না।

কিছুদিন পরে, আমি পিতা মহাশয়কে পুনঃ আগ্রহ করিয়া বলিলাম যে, ভাল আপনি কাশীধামে গিয়া পঠন-পাঠন করিতে নিষেধ করিয়াছেন ক্ষতি নাই, কিন্তু, আমাদিগের বাটী হইতে তিনক্রোশ দূরে, অমুক গ্রামে, একজন আমাদিগের স্বজাতীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত বাস করেন ও তিনি একজন বিখ্যাত বিদ্বান, বিশেষতঃ, সেই গ্রাম ও আমাদিগের জমীদারীর অন্তর্গত, অতএব আমি উক্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতজীর কাছে গিয়া পঠন পাঠন করিতে ইচ্ছা করি ও আশা করি যে, ইহাতে আপনার কোন আপত্তি থাকিতে পারেনা। আমার এই প্রস্তাবে পিতা-মাতা উভয়ে স্বীকৃত হইলেন। আমি কিছু কাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রশংসিত পণ্ডিতজীর নিকট মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। দৈববশাৎ এক দিবস তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ করিতে

করিতে আমার প্রকৃত মনোভাব হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যে, আমি অন্তর হইতে আমার বিবাহ সম্বন্ধে ঘৃণা ও বিবাহ করিতে অনিচ্ছার ভাব কোন মতেই দূরীকরণ করিতে সমর্থ নহি, ও ইহা দূরীকরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কথা কোন রূপে আমার পিতার কর্ণগোচর হইল এবং তিনি তখনই আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও আমার বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে আমার বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত আয়োজন হইতেছে ও বিবাহোপযোগী প্রায় সমস্ত দ্রব্য একত্রিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ সময় আমার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর হইয়াছিল।

আমার মনে পূর্ব্ব হইতেই গৃহ পরিত্যাগের সঙ্কল্প ছিল; পরন্তু, এ বিষয় কেহই সম্মতি দিত না, বরং সকলেই বিবাহ করিবার জন্যই সম্মতি প্রদান করিতেন। তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বিবাহ করা ভিন্ন বাটীর লোকে আমাকে কোথাও যাইতেও দিবেন না ও বিবাহ সম্পন্ন হইলে আর আমাকে ভবিষ্যতে কোন মতেই অধিক বিদ্যোপার্জ্জনের সুযোগও দেওয়া হইবে না; বিশেষতঃ, মাতা পিতা উভয়েই আর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে দিবেন না ও করিতে গেলেও বিশেষ রূপ বিরক্ত ও অপ্রসন্ন হইবেন। তখন আমি অনেক অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া চিন্তিয়া ও বিচার করিয়া মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আমার পক্ষে এখন এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা আমি আজীবন এই বিবাহ উপাধি হইতে রক্ষা পাইতে পারি। অবশ্য আমি আমার এই মনোভাব কাহারও নিকট প্রকট করি নাই। এক মাসের মধ্যেই বিবাহের প্রায় সমস্ত আয়োজনই পূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং তখন আমি অনন্যোপায় হইয়া সম্বৎ ১৯০৩ অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, ২২ বৎসর বয়সে, একদিন সায়ং কালে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, পরমাত্মার উপর নির্ভর করতঃ, বাটীর প্রতি মায়া মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর গৃহ-ত্যাগ-রূপ
প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমি আমাদিগের বাটী হইতে ৮মাইল বা চারি ক্রোশ দূরে এক গ্রামের প্রান্তে রাত্রি যাপন করিলাম। দ্বিতীয় দিবস রাত্রি এক প্রহর থাকিতে উঠিয়া, আন্দাজ ২০ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া, সায়ংকালে এক গ্রামে আসিয়া পৌছিলাম। সেই গ্রামে এক হনুমানজী অর্থাৎ মহাবীরের মন্দিরে রাত্রি যাপন করিলাম। আমি এই যাত্রাকালে প্রসিদ্ধ ২ গ্রাম বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলাম; কারণ আমার নিশ্চয় ধারণা ছিল,পিতা মহাশয় আমার সন্ধানে নিশ্চয়ই লোক, ঘোড়া ও সওয়ার পাঠাইবেন, যাহারা প্রধান প্রধান ঘাটিতে আমার অনুসন্ধান করিবে।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তির তৃতীয় দিবসে, আমি পথি মধ্যে এক রাজপুরুষের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে,অমুকের পুত্র গৃহত্যাগ করিয়া পালাইয়াছে ও তাহার সন্ধানে অনেক লোক জন পদব্রজে ও অশ্বারোহণে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা উক্ত গ্রামে আসিয়া ছিল ও কোন অনুসন্ধান না পাওয়ায় আগে চলিয়া গিয়াছে। এ স্থলে আমার সম্বন্ধে আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিল এবং তাহা এই যে,আমি বাটী হইতে বাহির হইয়াই প্রকৃত যোগী সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলাম। পথি মধ্যে এক ঠগ সন্ন্যাসীর দলের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল ও তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবামাত্র, তাহারা আমাকে স্বর্ণাঙ্গুরী হস্তে ধারণ দেখিয়া,বুঝাইয়া দিল যে, তোমার নিকট যাবৎ এক কপর্দ্দক মাত্রও সঞ্চিত থাকিবে,তাবৎ তুমি প্রকৃত বৈরাগ্য-শালী হইতে পারিবেনা ও তোমার পক্ষে যোগ-সাধন একবারে অসম্ভব হইবে। একারণ তোমার যাহা কিছু ধন বা ভূষণাদি সঙ্গে আছে তাহা,সাধুগণকে দান কর, কারণ সাধু সন্ন্যাসীকে যাহা দান করিবে, তাহাই ইহকালে ও পরকালে তোমার সুখ ভোগ্য হইবে। আমি তাহাদিগের ভ্রম জালে পতিত হইয়া, আমার নিকট যাহা কিছু টাকা কড়ি ও অঙ্গুরী আদি ভূষণ ছিল, তৎ সমুদায় অর্পণ করিলাম। অর্থাৎ ঐ বৈরাগীর দলে একটী বিগ্রহ বা ঠাকুরের মূর্ত্তি ছিল, তাহারা আমাকে উক্ত ঠাকুরের নামে সংকল্প করাইয়া

আমার নিকট হইতে সমস্ত ফাঁকি দিয়া ঠকাইয়া লইল। এইরূপে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া, রিক্ত হস্তে আমি সায়লে গ্রামে লালা ভকতের বাটী * উপস্থিত হইলাম। লালা ভকৎ একজন সাধু ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেখানে অনেক ব্রহ্মচারী ও সাধুর সমাগম হইত। আমি যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন তথায় একজন ব্রহ্মচারীর সহিত আমার বিশেষ আলাপ হইয়া গেল। তিনি আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলাম। তিনি আমার গৃহের পূর্ব্ব পরিধেয় বস্ত্রগুলি ছাড়াইয়া গৈরিক কষায় বস্ত্র পরিধান † করাইয়া আমাকে শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মচারী নাম প্রদান করিলেন ও আমাকে যথারীতি কৌপীন ও হস্তে কমণ্ডলু ধারণ করাইলেন। আমি এই মণ্ডলীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, যোগ শিক্ষা করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রিতে এক বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া আছি, এমন সময় বৃক্ষোপরি পক্ষিগণ ঘুঁ ঘুঁ শব্দ করায়, আমি ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলাম। কিছুকাল তথায় থাকিয়া, ঐ ব্রহ্মচারী বেশেই সায়লে হইতে কোট কাঙ্গড়া নামক এক ছোট কসবা(জনপদ), যেখানে এক সামান্য দেশী রাজার রাজ্য ছিল, তথা হইতে আহমদাবাদ (গুজরাত) আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে বিস্তর বৈরাগীর আবাস ছিল, ও এই বৈরাগী মণ্ডলীর মধ্যে একজন রাণী পতিতা হইয়া তাহাদিগের মধ্যে বাস করিতেন। ইনি যে কোথাকার রাণী, তাহা আমি বলিতে পারি না। ইনি আমাকে গৈরিক বেশ ধারী দেখিয়া পরিহাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন ও আমাকেও তাঁহার জালে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; পরন্তু, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতাম। তথাকার বৈরাগীগণ আমার রেশমী পাড়ের ধুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক

* এই গ্রাম অহমদাবাদ মোরভী রেলওয়ের মোলী ষ্টেশন হইতে চারি ক্রোশ দূরে ও বানপুর আর্য্য সমাজ হইতে ১১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

† প্রকৃত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে নৈষ্ঠিক বা নিষ্ঠাবান হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া,পরে উপযুক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়ম আছে। এই আশ্রমে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণের সহিত, নিত্য নৈমিত্তিক হোমাদি পঞ্চমহাযজ্ঞের সাধন ও শরীরে ভস্ম লেপন করিতে হয়।

সময় হাস্য করিয়া বলিতেন, ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমিও বিচার করিয়া দেখিলাম, এ কথা একবারে অসত্য নহে; এজন্য, বৈরাগী গণের নিকট উহা ফেলিয়া দিলাম ও তখন আমার নিকট যে তিন টাকা ছিল, তদ্দ্বারা সামান্য বস্ত্র খরিদ করিয়া, তৎ পরিবর্ত্তে তাহা পরিধান করিলাম। এই স্থানে আমি ব্রহ্মচারী নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম। এখানে আমি তিন মাস অবস্থান করি।

কোট কাঙ্গড়ায় অবস্থান কালে আমি শুনিয়াছিলাম যে, কার্ত্তিক মাসে সিদ্ধপুরে এক মেলা বসে, ও তথায় অনেক সাধু ও যোগীগণের সমাগম হয়। আমি ভাবিলাম যে, যখন এই মেলা উপলক্ষে অনেক যোগ-বিশারদ সাধু ও সন্ন্যাসীগণ সমবেত হন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন না কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকট হইতে অমরত্ব পাইবার উপদেশ লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এইরূপ আশা করিয়া, আমি সিদ্ধপুরে যাত্রা করিলাম। পথি মধ্যে আমার সহিত একজন পূর্ব্ব-পরিচিত বৈরাগীর সাক্ষাৎ হইল। এই বৈরাগী আমার জন্মভূমির নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামবাসী। ইনি আমার কুল-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্রই আমাদিগের উভয়েরই চক্ষে জল আসিল। পরে তিনি আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায়, আমি যথাক্রমে তাঁহাকে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করা হইতে পথিমধ্যে ধূর্ত্ত পাষণ্ডগণ আমাকে ঠকাইয়া আমার ধন ও অলঙ্কারাদি লওয়া ও তৎপরে সায়লে গ্রামে ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া যথারীতি মুণ্ডনাদি সহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক গৈরিক বসন পরিধানাদি বিষয় বর্ণন করিলাম। প্রথমে তিনি এই সমস্ত শুনিয়া ও আমার ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি দেখিয়া হাঁসিতে লাগিলেন; পরে,অতীব খেদের সহিত আমাকে গৃহ-ত্যাগাদি জন্য ধিক্কারাদি দিয়া, আমাকে গৃহ ত্যাগের প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলাম ও আরও বলিলাম যে আগামী কার্ত্তিক মাসে সিদ্ধ পুরে মেলা দেখিতে যাইব। এই বলিয়া আমি সিদ্ধপুরাভিমুখে* যাত্রা

* সিদ্ধপুরে রেল ষ্টেশন আছে। এই স্থানে সরস্বতী নদীতীরে কার্ত্তিক মাসে মেলা হয়, যথায় উদীচ্য ব্রাহ্মণ পুত্রগণের মুণ্ডন সংস্কার হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে আমি এক বিষয় বর্ণন করিতে ভুলিয়া গিয়াছি ও তাহা এই যে, স্বামিজি যে উদীচ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে সহস্র উদীচি কুল বলে। এই কুলের পূর্ব্বজ ব্রাহ্মণগণ কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে, এক হাজার সংখ্যায় কান্যকুব্জাদি হইতে আসিয়া গুর্জ্জর দেশে বাস করেন। এবিষয়ের সঠিক বৃত্তান্ত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের ইতিহাসে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সহ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, স্বামীজির পূর্ব্ব

করিলাম এবং সিদ্ধপুরে আসিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে অবস্থান করিলাম।

এই স্থানে অনেক দণ্ডী স্বামী ও ব্রহ্মচারীগণ পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত ছিলেন। ইহাঁদিগের সহিত আমি প্রায় সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে দিন যাপন করিতাম এবং ঐ মেলাতে কোন মহাত্মা বা পণ্ডিতের আগমন শুনিবা মাত্রই তাঁহাদের দর্শন ও তাঁহাদিগের সহিত বার্ত্তালাপ ও বিচারাদি করিতাম ও তাঁহাদের নিকট হইতে

নাম মুলজী ত্রিবাড়ী ছিল এবং ইহাদিগের বংশধরগণ ত্রিবাড়ী অর্থাৎ (ত্রিপাটী) উপাধিধারী ছিলেন। বর্ত্তমান তিওয়ারি শব্দ ত্রিপাটির অপভ্রংশমাত্র।

এ বিষয় বিস্তারিত রূপে পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্ম্মা কৃত কান্যকুব্জগণের ইতিহাস নামক হিন্দি-পুস্তকে বর্ণিত আছে। শ্রীস্থলপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ২৯ ও ৩০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, গুজ্জর দেশস্থ পাটন নামক রাজধানীর প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক রাজা মূলদেব, নিজ গুরু ও পুরোহিতের আজ্ঞানুসারে, উদীচ্য (উদীচ্যঃ পশ্চিমোত্তরঃ) দেশের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-গণকে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থিত প্রয়াগ রাজ্য হইতে ১০৫ জন, চ্যবনাশ্রম (যাহা ফরক্কাবাদের নিকট অবস্থিত) তথা হইতে ১০০ জন, সরযূতীরস্থ অযোধ্যা হইতে ১০০ জন, কানাকুব্জ বা কাণোজ হইতে ২০০ জন কাশীধাম হইতে ১০০ জন, নৈমিষারণ্য তীর্থ হইতে ১০০ জন, হরিদ্বার হইতে ১০০ জন, কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ হইতে ১০০জন, পুষ্করক্ষেত্র হইতে ১৩২ জন এইরূপে সর্ব্বসমেৎ ১০৩৭ জন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে সিদ্ধপুর আদি কয়েক গ্রামে অবস্থিত করান। শ্রীস্থলপ্রকাশে, আরও লিখিত আছে যে, এই ১০৩৭ জন ব্রাহ্মণ মধ্যে, ১০০০ এক সহস্র কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ও বক্রি ৩৭ জন টোলক গোত্র বা জাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা, "সহস্র সংজ্ঞকাঃ কেচিদপরে টোলকাহ্বয়াঃ" অর্থাৎ ইহাদিগের মধ্যে এক সহস্র উদিচ্য ও অপর ৩৭ জন জন টোলক নামে কথিত হন। শ্রীস্থলপ্রকাশ ও উদীচ্যপ্রকাশে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় পাওয়া যায়।

"তথাপি যদিতে শ্রদ্ধা বিদাতে দান সত্তমা।
রাজন্ পুরবরং দেহি শ্রীস্থলাখ্যং মনোরমম্॥ শ্রীস্থলপ্রকাশ।
বেদনেত্র নবসম্মিত বর্ষে কার্ত্তিকে শশিতিথৌ রবিবারে।
মূলদেবনপতিঃ সমদাসদ্ গ্রাম দানমিতি পণ্ডিতকেভ্যঃ॥

উদীচ্য প্রকাশ অ: ১ শ্লোক ৫৬।

অর্থাৎ হে রাজন্! তথাপি যদি আপনি একান্তই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাদিগকে ভূমিদানাদি দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তবে আপনি মনোরম শ্রীস্থল অর্থাৎ বর্ত্তমান সিদ্ধপুর আমাকে (আমাদিগকে) বসবাস করিবার জন্য প্রদান করুন্।

৯২৪ শকের (অর্থাৎ সম্বৎ ১০৫৯ ও সন ১৩০৩) কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রবিবাসরে রাজা মূলদেব ব্রাহ্মণগণকে গ্রাম দান করিলেন।

একদা স্বামী দয়ানন্দ স্বামী স্বয়ং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের থিওসফিষ্ট নামক

যথাসাধ্য জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করিতাম। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্য বশতঃ, যে বৈরাগীর সহিত আমার কোট কাঙ্গড়ার সন্নিকটে পথিমধ্যে দেখা হয়, তিনি আমার ও আমার বাটীর সকলের পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া পিতা মহাশয়কে আমার গৈরিক বসন ধারণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়াও আমি যে কার্ত্তিক মাসে সিদ্ধপুরের মেলায় গমন করিব, এই সমস্ত সংবাদ অবগত করান। ইতিমধ্যে আমার পিতা মহাশয় চারিদিকে লোক পাঠাইয়া আমার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, এবং যখন তিনি উক্ত বৈরাগী প্রমুখাৎ আমার পাকা সংবাদ পাইলেন, তখনই তিনি স্বয়ং চারিজন সিপাহি সহ সিদ্ধপুরের মেলায় যাত্রা করিলেন এবং মেলায় আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই তিনি

ইংরাজি পত্রিকার নিজ জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার সময় বর্ণনা করেন যে— I was born in the family of Northern Brahmin in a town belonging to the Raja of Morvi in Kathiyawar in 1824. ইহার সাদা অনুবাদ এই যে আমি (দয়ানন্দ) উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণ-কুলে কাটিয়াওয়াড়ের অন্তর্গত মোরভী রাজার রাজ্যে কোন এক নগরে জন্মগ্রহণ করি। দাক্ষিণাত্য দেশে জন্মিয়া উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করি বলাতেই বেশ বুঝা যায় যে, অন্ততঃ তিনি পঞ্চ গৌড় জাতীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও দক্ষিণদেশীয় পঞ্চদ্রাবিড় সংজ্ঞায় জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ, উদিচ্য শব্দ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এই উদিচ্য ব্রাহ্মণগণ উত্তর পশ্চিম বা উত্তর দেশবাসী। ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কৃত দয়ানন্দ চরিত প্রণয়নকালে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া ষোড়শবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানের পর, নিজ অন্তিম মত প্রকাশ করেন যে, Dayarund's father was Karsanjec Lalljie Teware :(Trepatee). In other words, according to the custom of the Bcmbay Presidensy one has to write his father's name first and then his own name, therfore it follows that Karsanjee was Dayanand's father and Laljee was his grand-father. His family belonged to Samvedi Udichya Brahmin and he was of Dalavya Gotra. "The family was known as Teware family, because Tewari was the surname of the family. Tewari means one whose fore-fathers had to read the Three Vedas. It is an abbreviation of Tripathy *ie* the Reader of the Three Vedas :

একণে বক্তব্য এই যে দালভ্য গোত্র কেবলমাত্র কানাকুব্জ ব্রাহ্মণ মধ্যেই পাওয়া যায় (দেখ কানাকুব্জ ভাস্কর ১২ গোত্র)। ত্রিপাঠী শব্দ হইতেই তিওয়ারী পশ্চিমাঞ্চলেও ত্রিবাড়ী গুর্জ্জর দেশে কথিত হয়। উপর্য্যুক্ত বিষয় ১৯২৬ সালের ফেবরুয়ারী মাসের Veidic Magazine নামক ইংরাজী পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। এবিষয় আরও অনেক প্রমাণ আছে, যাহা বাহুল্যভয়ে বর্ণন করিলাম না।

আমার বাসস্থান খুজিয়া বাহির করিলেন ও এক দিবস প্রাতঃকালেই চারিজন সিপাহী সহ আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সে সময় তাঁহার মূর্ত্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। তিনি ক্রোধে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার দিকে তাকাইতে সাহস করিলাম না। পিতার এইরূপ অকস্মাৎ উপস্থিতি দেখিয়া, আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। পিতা মহাশয় রাগের মাথায় তাঁহার মুখে যাহা আসিল তাহাই বলিতে লাগিলেন; ও নানা-প্রকার ধিক্কার দিলেন ও শেষে বলিলেন "তুই আমার অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিস, কারণ তোর এই ব্যবহার জন্য আমার পবিত্র কুল চির-কালের জন্য কলঙ্কিত হইবে।" *

পিতার এই প্রচণ্ড উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে ভয় হইল যে পিতা মহাশয় নিশ্চয়ই আমার প্রতি যার পর নাই নির্দ্দয় ব্যবহার পূর্ব্বক,আমার দুর্দ্দশা করিবেন। তজ্জন্য আমি তৎক্ষণাৎ পিতৃ-চরণে প্রণত হইয়া,চরণ-স্পর্শ-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম ও বলিলাম যে, আমি ধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিতও প্রতারিত হইয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি ও তজ্জন্য বিশেষ দুঃখও ভোগ করিতে হইয়াছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া নিজ ক্রোধ শান্ত করুন। আমি নিজেই গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, ভাল হইল যে, আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি।

এক্ষণে একটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে,দয়ানন্দ বা শুদ্ধ-চৈতন্য-ব্রহ্মচারী, পিতার সমক্ষে ক্ষমা-প্রার্থী হইয়া যে সকল কথা বলিয়া ছিলেন তাহা, বাস্তবিক তাঁহার আন্তরিক মনোভাব ছিল কি না। ঐ কথা গুলিকে সরল স্বভাব ও অকুতো-ভয়তার পারিচায়ক বলিয়া বর্ণন করিতে পারা যায় না। বলিতে কি,কেহ তাঁহাকে কুপরামর্শ দেয় নাই,কাহারও প্ররোচনায় তিনি গৃহত্যাগ করেন নাই ও বিশেষতঃ তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন করিবার আদৌ আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না; পরন্তু, ইহা মনুষ্য

* পাঠকগণের জানা উচিত যে, দয়ানন্দ সরস্বতীর পিতা সম্পূর্ণ রজোগুণী লোক ছিলেন। অত-এব তাঁহার পুত্রের মনে পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাব উদয় জন্য তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই; যেহেতু তাঁহার পুত্র তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিয়া, বিবাহ করে নাই, পালাইয়াছে, ও তৎপরে সে একজন ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র হইয়া, দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও ভিক্ষুকের ন্যায় গৈরিক বেশ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে ও ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেছে; এজন্য তিনি তাঁহার পুত্রকে "কুল-কলঙ্ক" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বভাব এবং দয়ানন্দও তখন পর্য্যন্ত প্রকৃত দয়ানন্দ হইতে বা ঋষিত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই ; এ কারণ তাঁহার হৃদয়ে তখনও প্রকৃত বিবেক ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের পূর্ণবিকাস হয় নাই। এজন্য হঠাৎ ভীতির আবেগে ও অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটায়; তিনি কিং-কর্ত্তব্য-বোধ-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ, ঐরূপ উগ্রচণ্ডা পিতার সম্মুখে, তিনি অকুতোভাবে নিজ মনোবৃত্তি প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার বাল্য-সংস্কার বশতঃ, পিতার সম্মুখে মস্তক অবনত করা ও আজ্ঞা-পালন-রূপ-কর্ত্তব্যতার-সংস্কারই তখনও তাঁহার মনে বিরাজিত ছিল। অথবা এরূপও হইতে পারে, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে,এ ক্ষেত্রে যদি তিনি পিতৃ-মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না ; অর্থাৎ তিনি অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং নিশ্চয়ই ইহ জীবনের সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তত্ত্বদর্শী ঋষির পক্ষে একার্য্য বিষ সদৃশ হইতে পারে ; কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু যুবকের পক্ষে এরূপ কার্য্য স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। (গ্রন্থকার)

যাহা হউক, আমার এই ব্যবহারে পিতার ক্রোধের বেগ কথঞ্চিৎ শান্তি হইল বটে, পরন্তু তখনও তাঁহার ক্রোধের পূর্ণ শান্তি হয় নাই। তিনি অত্যন্ত ক্রোধ পরবশ আমার গৈরিক পরিধান কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, আমার কমণ্ডলুকে আছ্ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও রাগের মাথায় অনেক কুবচন বলিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে একটী নূতন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইলেন ও নিজে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তথায় আমাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন যে, "তুই মাতৃঘাতক * তুই তোর মাতাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিস্" একথা শুনিবামাত্র আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম ও বলিলাম "আমি নিশ্চয় বাড়ী যাইব"।

যাহা হউক আমার এই শেষ কথায় যদিচ পিতার ক্রোধের শান্তি হইল বটে,

---

* আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মহাত্মা দেখা গিয়াছে বা দেখা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই মাতৃভক্ত ছিলেন। এজন্য যখন দয়ানন্দকে "মাতৃঘাতক" এই কথা বলা হইল তখনই তাঁহার মন একবারে গলিয়া গিয়াছিল, এবং তখন তিনি যে মনের আবেগে বাড়ী যাইব বলিয়া ছিলেন তাহাতে বোধ করি তাঁহার কোনরূপ সরলতার অভাব ছিল না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবেরও সন্ন্যাস গ্রহণের পরে, মাতার নামোচ্চারণকালে চক্ষে জল আসিয়াছিল।

পরন্তু, তিনি আমার কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত বা নিরুদ্বেগ হইতে পারিলেন না ও যাহাতে আমি পুনরায় পলায়ন করিতে না পারি, তন্নিমিত্ত দুই জন সিপাহী দ্বারা আমাকে দিবারাত্রি পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। ইহারা পালাক্রমে আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিত। সিপাহীরা বাস্তবিক জাগ্রত থাকে কি না জানিবার জন্য,আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক রাত্রি কালে কৃত্রিম নাসাধ্বনি করিতাম, যাহাতে প্রহরীগণ মনে করে যে, আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছি। আমার এইরূপ চাতুরী প্রহরীরা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিত আমি বাস্তবিকই ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত, পরন্তু আমি প্রায় সমস্ত রাত্রিই জাগিয়া কাটাই-তাম ও সর্ব্বদাই মনে মনে পলায়ন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতাম। সিপাহিরা প্রায়ই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিত। ক্রমাগত তিন দিবস উপর্য্যুপরি জাগরণের পর, চতুর্থ দিবস রাত্রিকালে সিপাহীগণ নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল ও আর জাগ্রত থাকিতে না পারায় ঘুমাইয়া পড়িল। তাহারা ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ হেতু গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে সিপাহীগণ গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে। তখন ইহাই প্রকৃত সুযোগ মনে করিয়া আমি রাত্রি ৩টার সময় (১) প্রাতঃকৃত্য সমাপনের ছলে একটী ঘটী হাতে করিয়া প্রস্থান করিলাম ; তৎপরে নগর অতিক্রম করিয়া এক উদ্যানে প্রবেশ করতঃ,এক পুরাতন মন্দিরের শিখরস্থ প্রকাণ্ড বট বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুকায়িত রহিলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, দেখি দৈব কিরূপ আমার প্রতি ঘটায়। রাত্রি চারিটার সময় প্রহরীগণ জাগিয়া আমাকে খুঁজিবার জন্য উক্ত উদ্যানে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং কয়েকবার মন্দিরের ভিতরে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল ও উদ্যান রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল কেহ এই উদ্যানে আসিয়াছিল কিনা। এইরূপে তাহারা চারিদিকে আমার অনু-সন্ধান করিতে লাগিল। শেষে সমস্ত আশ পাশের স্থান অনুসন্ধানের পর, আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারায় হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। এদিকে আমি চুপ করিয়া বৃক্ষারূঢ় থাকিয়া সমস্ত দিবস অনশনে অতিবাহিত করিলাম।

---

(১) কোন কোন গ্রন্থে তৃতীয় দিবস রাত্রি তিনটার সময় দয়ানন্দ পুনঃ পলাইয়া যান এরূপ লেখা আছে।

সন্ধ্যার পর বেশ অন্ধকার উপস্থিত হইলে আমি মন্দির শিখাস্থিত বটবৃক্ষ হইতে অতি সাবধানে অবতরণ করিয়া, মাতা পিতা স্বজন ও স্বগৃহ নিকট হইতে মনে মনে জন্মের মত বিদায় লইয়া, প্রচলিত মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম ও তথা হইতে দুইক্রোশ অন্তরে এক গ্রামে গিয়া অবস্থান করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই পুনঃ তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। আমার এইরূপ প্রস্থানের পর আর কোথাও আমার স্বগ্রাম বা পূর্ব্ব পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। একবার আমার কতিপয় স্বদেশস্থ ব্যক্তির সহিত প্রয়াগ তীর্থে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকে আমার নিজ কোন পরিচয় প্রদান করি নাই ও তাহার পর আজ পর্য্যন্ত আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি আহমেদাবাদ আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও তথা হইতে বরোদা মহানগরীতে অবস্থান করিলাম। তথাকার চৈতন্য মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী গণের সহিত আমার বেদান্ত বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। এইস্থানে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণের সহিত কথাবার্ত্তায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া গেল যে, আমাতে ও পরব্রহ্মে বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ নাই। যথা "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই পদার্থ। যদিচ ইতঃপূর্ব্বে বেদান্তশাস্ত্র পঠনকালে আমি এই জীবব্রহ্মের একতা বিষয়ক সিদ্ধান্তের বিচার করিয়াছিলাম পরন্তু, তখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই। এইবারে আমি এ বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইলাম ও আমার জীবব্রহ্ম বিষয়ক বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া গেল।

বরোদাতে একজন কাশীবাসী বাইয়ের * নিকট শুনিয়া ছিলাম যে নর্ম্মদা তটে শীঘ্রই এক সভায় বড় বড় বিদ্বান্‌-সাধু ও যোগীগণের সমাগম হইবে। আমি এই শুভ সংবাদ পাইবা মাত্রই তৎস্থানে যাত্রা করিলাম। তথায় উপস্থিত হইলে সচ্চিদানন্দ পরমহংসের † সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁহার সহিত অনেক

---

* বঙ্গভাষায় "বাই" শব্দে আমরা যে সকল বারাঙ্গনা মজলিসে নৃত্য গীতাদি করে তাহাকেই বুঝায়, পরন্তু গুজরাট ও মারহাট্টা দেশে বিদুষী ও ভদ্রবংশীয় মহিলাগণকেই "বাইজী" সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যথা রমাবাই, মীরাবাই, ইত্যাদি।

† কোন কোন জীবন চরিত্রে ইহার নাম যোগানন্দ লিখিত আছে। হইতে পারে ইহার দুই নামই প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রকার শাস্ত্র বিষয়ক বার্ত্তালাপ হইয়াছিল। এই পরমহংস দেবের নিকট আমি জ্ঞাত হইলাম যে, চানোদ কল্যাণী নামক স্থানে (যাহা নর্ম্মদার তীরে অবস্থিত) বড় বড় বিদ্বান্ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণের মণ্ডলী অবস্থিত আছে। এই সংবাদ পাইবা মাত্রই আমি তথায় যাত্রা করিলাম।

আমি এই পবিত্র স্থানে পৌছিয়া সর্ব্বাগ্রে কতিপয় প্রকৃত দীক্ষিত বিদ্বান্ ও চিদাশ্রমাদি নামধেয় স্বামী সন্ন্যাসী ও যথার্থ পণ্ডিতের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বলিতে কি, ইহার পূর্ব্বে আমি এরূপ প্রকৃত বিদ্বান স্বামী বা ব্রহ্মচারীর দর্শন পাই নাই। তৎপরে আমি পরমানন্দ নামক পরমহংসের নিকট বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। আমি কিছুকাল তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া, বেদান্তসার, আর্য্যহরিতোটক, আর্য্যহরিহরতোটক, বেদান্ত-পরিভাষা আদি বেদান্ত-তত্ত্ব-বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক সকল রীতিমত পাঠ করিলাম।

এ সময় আমি ব্রহ্মচারী বিধায়, বিশেষতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিধায়, আমাকে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হইত, একারণ আমার পাঠ বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি ঘটিত। এই উপাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় ও বিশেষতঃ এই ব্রহ্মচারী অবস্থায় কেহ কেহ আমাকে আমার গৃহের পূর্ব্ব নাম দ্বারাই আহ্বান করায়, আমার পিতামাতার সহিত আমার পুনঃ সন্ধান পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ বিচার করিয়া,মনে মনে সংকল্প করিলাম যে চতুর্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই এই সমস্ত উপাধি স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। আমার কুল প্রসিদ্ধির কারণ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকিলে একদিন সহজেই স্বজনবর্গের দ্বারা ধৃত হইতে পারি ও তখনও আমাকে তাঁহারা অনায়াসে গৃহাশ্রমে বা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট করাইতে পারেন, এবং আমিও হয়ত গুরুজনের বিশেষতঃ মাতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া পুনঃ গৃহে প্রবিষ্ট হইতে পারি। পরন্তু একবার সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিলে, আর কোন মতেই নিজকুলে প্রত্যাগমন সম্ভবপর হইতে পারে না।

তৎস্থানে উক্ত পরমহংসের নিকট কৃষ্ণশাস্ত্রী নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ থাকিতেন, ইনি আমার পরম মিত্র ছিলেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় আমার প্রার্থনানুসারে চিদাশ্রম স্বামীকে বলিলেন, আপনি কৃপা করিয়া এই ব্রহ্মচারীকে

(অর্থাৎ আমাকে) সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত করুন। পরন্তু উক্ত পরম দীক্ষিত সন্ন্যাসী মহোদয় আমাকে নব যুবক দেখিয়া যথারীতি সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত করিতে সম্মত হইলেন না। যাহাহউক একথা শুনিয়াও আমি উৎসাহ ভঙ্গ হইলাম না, এবং প্রায় দেড়বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত নর্ম্মদা তীরে বাস করিয়া যথারীতি পাঠাদি করিতে লাগিলাম। এইরূপে যখন আমার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর ২ মাস হইয়াছিল তখন আমি শুনিলাম যে, একজন মহাবিদ্বান্ দণ্ডী স্বামী ও একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী চানোদের আন্দাজ ২ ক্রোশ দূরে এক জঙ্গলে বাস করিতেছেন। সংবাদ পাইবা মাত্রই, আমি আমার পূর্ব্ব পরিচিত কৃষ্ণশাস্ত্রীর সহিত তাঁহাদের দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলাম এবং উক্ত সাধুদ্বয়ের সহিত ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বার্ত্তালাপ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাঁরা উভয়েই ব্রহ্মবিদ্যায় বিশেষ প্রবীন ও মহাবিদ্বান্। এই দণ্ডী স্বামীর নাম পূর্ণানন্দ সরস্বতী। আমি পণ্ডিতজীকে আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলাম। তখন শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত স্বামীজির নিকট বিনীত প্রার্থনা করিলেন মহারাজ! এই ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী, অত্যন্ত সুশীল ও ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার জন্য ও তৎসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। ইহাকে ব্রহ্মচারী বিধায় নিজ হস্তে পাকাদি করিয়া ভোজন করিতে হয় ও ভিক্ষা যোগাড় করিতে বিশেষ কষ্টবোধ ও সময় নষ্ট হয়; এজন্য ইহার পাঠে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। কৃপা করিয়া ইহার আশা পূর্ণ করিয়া ইহাকে চতুর্থাশ্রমে (সন্ন্যাসাশ্রমে) যথারীতি দীক্ষিত করিতে আপনার আজ্ঞা হউক। এই সন্ন্যাসীও আমার যুবাবস্থা দেখিয়া আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিতে সহজে সম্মত ও সাহসী হইলেন না। যখন আমার মিত্র বার বার বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তখন ও তিনি একটা ওজর করিয়া বলিলেন যে "দেখ আমি মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসী এবং এই ব্রহ্মচারী গুর্জ্জর দেশীয়, এজন্য একজন গুজরাতী সন্ন্যাসী দ্বারা ইহাঁর সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হওয়া উচিত।" একথার উত্তরে আমার মিত্র বলিলেন যে গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রীয় উভয়েই পঞ্চ দ্রাবিড়ের * অন্তর্গত। এ ব্রহ্মচারী গুর্জ্জর দেশের অতএব

* ব্রাহ্মণের মধ্যে দুইটী বিভাগ আছে, যথা পঞ্চগৌড় ও পঞ্চ দ্রাবিড় বা দক্ষিণী। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পাঁচ প্রকার, "পঞ্চ গৌড়" ব্রাহ্মণ। আর মহারাষ্ট্রীয় গুজরাতী ইত্যাদি ইহাঁরা পঞ্চদ্রাবিড় মধ্যে পরিগণিত।

ইহাকে আপনি অনায়াসে দীক্ষিত করিতে পারেন। এ কথা শুনিয়া স্বামীজি প্রসন্ন চিত্তে দীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন ও তখন তিনি আমাকে যথারীতি সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, দণ্ড. কমণ্ডলু ধারণ করাইলেন ও আমার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন করাইয়া আমার নাম দয়ানন্দ সরস্বতী রাখিয়া দিলেন।

ইতি শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতীর সন্ন্যাস আশ্রম-গ্রহণ রূপ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে আমি আমার দীক্ষাগুরুর আজ্ঞা লইয়া দণ্ড ধারণ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম.কারণ উহা সর্ব্বদা করিতে হইলে তজ্জন্য আমায় অনেক গুলি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইত, যাহা করিতে গেলে, আমি যে সকল উপাধি হেতু পাঠ বিষয়ক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা, অনেকটা পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যাইত। এই স্বামীজীর কাছে কিছুদিন ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে রহিলাম। ইনি ও ইহার সঙ্গে যে ব্রহ্মচারী ছিলেন ইহারা দুই জনেই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দক্ষিণ শৃঙ্গেরী মঠ* হইতে দ্বারিকা মঠে যাইবার ইচ্ছায় বাহির হইয়া ছিলেন; কাজেই ইহাঁরা আর অধিক দিন উক্ত স্থানে অবস্থান না করিয়া দ্বারিকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎপরে আমি কিছুকাল চানোদ কল্যাণীতেই বাস করিতে

* শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য মহাশয় যখন দিগ্বিজয় করিয়া নিজমত স্থাপন করেন, তখন তিনি ভারতের চারি দিকেই নিজমত স্থাপনার্থ কয়েকটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পশ্চিমে দ্বারিকা, উত্তরে টেহড়ী ও পূর্ব্বদিকে জগন্নাথাদি মঠ স্থাপন করেন। এইগুলি এক এক জন প্রধান মহান্তের অধীন। ইহাঁরা গুরু-পরম্পরা জগৎগুরু শঙ্করাচার্য উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

করিতে শুনিলাম যে ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দ নামে এক স্বামী আছেন, যিনি যোগ বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ। এই সংবাদ পাইবামাত্রই আমি শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট যোগ-বিদ্যা পাঠ ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। এই যোগানন্দ স্বামীর নিকট আমি প্রায় সমস্ত যোগগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম ও যোগ ক্রিয়ার * পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া চতোর (ছিনোড়) নগরের উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানের নিকটেই কৃষ্ণশাস্ত্রী নামক একজন প্রবীণ বিদ্বান দক্ষিণী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইহাঁর নিকট কিছু কাল ব্যাকরণ বিষয়ক শঙ্কা সমাধান ও বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া, পুনঃ চানোদকল্যাণীতে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে আমি রাজগুরুর নিকট বেদাভ্যাস করি। কিছুদিন থাকিবার পর তথায় জ্বালানন্দ পুরী ও শিবানন্দগিরি নামক দুইজন সাধু যোগীর সহিত আমার পরিচয় হইল। আমি তাঁহাদের সহিত কিছুকাল যোগালাপ ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে উক্ত যোগীদ্বয় আহমেদাবাদে যাত্রা করিলেন ও আমাকে বলিলেন যে, একমাস পরে তুমি আমার সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিবে এবং তখন আমি তোমাকে উক্ত স্থানে (অর্থাৎ যেখানে যাইতে বলিয়াছিলেন, তথায়) যোগ সাধনের পূর্ণ গূঢ়তত্ত্ব ও তদসম্বন্ধীয় ক্রিয়া সকল উত্তম প্রকারে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিব। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে অহমেদাবাদের নদীতটে দুগ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে তাঁহারা অবস্থান করিবেন। একমাসের পরে আমি তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে আহমেদাবাদে যাত্রা করিয়া উক্ত দুগ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে তৎস্থানে যোগের গূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালী, যাহা স্বয়ং করিয়া দেখাইবার ও শিক্ষা দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা, পূর্ণতয়া পালন করিয়াছিলেন। বলিতে কি, এই যোগীদ্বয়ের নিকটেই আমি যোগবিদ্যা বিষয়ক প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হই, এ কারণ আমি আজীবন এই মহাত্মা দ্বয়ের নিকট বিশিষ্টরূপে ঋণী আছি। এই যোগী দ্বয় কিছুদিন পরেই রাজপুতানার অন্তর্গত আবুরাজ * নামক পবিত্র পার্ব্বতীয় তীর্থে গমন করিলেন ও তথায় যাইবার সময়

বলিয়া গেলেন যে, আবুপর্ব্বতের শিখরে অনেক যোগীজন ও মহাত্মাগণ বাস করেন।

*রাজপুতানার অন্তর্গত আবু আরাবলি পর্ব্বতের চূড়া স্থান। এখানে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধগণের অনেক মঠ ও মন্দিরাদি আছে, এখানে অনেক প্রকৃত সাধু মহাত্মা বাস করেন। এই আবু

আমিও কিছুদিন পরে যোগীজন দর্শনার্থ আবুরাজ্যে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় গিয়া উক্ত যোগীদ্বয়ের সহিত সর্ব্বদা ভবানীগিরিনামক পর্ব্বতশিখরে সম্মিলিত রহিলাম ও তথাকার অন্যান্য প্রসিদ্ধ যোগীরাজ গণেরও সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। এখানে একজন যোগীরাজের আমি সাক্ষাৎ পাই, যিনি উপরোক্ত গিরি ও পুরী-দ্বয় অপেক্ষাও অধিক উচ্চদর্শী ছিলেন। ইহাঁর নিকট থাকিয়াও কিছু কাল যোগতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানলাভ করি। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেথানে যোগী মহাত্মার নাম শুনিতাম, তথায় তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যার্থীস্বরূপ উপস্থিত হইয়া, আত্মিক উন্নতি ও মানসিক শান্তির উপায় ও সাধন বিষয় শিক্ষা করিতাম। এইরূপে বহুবিধ স্থানে সাধু মহাত্মা ও যোগীজনের সহিত বার্ত্তালাপ, সৎসঙ্গ ও যোগতত্ত্ব শিক্ষা করিতে করিতে আমি ১৯১২ বিক্রমাব্দে হরিদ্বারের কুম্ভ মেলার কথা শুনিলাম। এই সময় আমার বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। সন ১৮৫৫ সালের ১১ এপ্রেল তারিখে আমি হরিদ্বারে উপস্থিত হইলাম। আমার কুম্ভ মেলায় যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, উক্ত মেলায় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেক খ্যাতনামা সাধু সন্ন্যাসী ও যোগীজনের একস্থানে সমাগম হয় ও তথায় আমি ভারতবর্ষীয় শ্রেষ্ঠ সুযোগ্য যোগী ও তপস্বী মহাত্মাগণের দর্শন পাইয়া তাহাঁদিগের নিকট আত্মতত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব যথারূপে জ্ঞাত হইতে পারি, অপিচ যদি আমার পূর্ব্বজ্ঞাত কোন বিষয়ে কিছু ভ্রম রহিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহারও সংশোধন হইবে। বস্তুতঃ আমি হরিদ্বার কুম্ভে গিয়া একস্থানে শতসহস্র সাধু তপস্বী ও যোগীজনের সঙ্গম দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। হরিদ্বারে যতদিন মেলা ছিল, আমি ততদিন চণ্ডী পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়া যোগাভ্যাস করিতাম। তৎপরে বড় বড় বিখ্যাত যোগী মহাত্মা পণ্ডিত ও সাধুগণের সঙ্গে সৎসঙ্গ ও যোগ এবং আত্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতাম। মেলা ভঙ্গ হইয়া গেলে, আমি হরিদ্বারের উত্তর হৃষীকেশ নামক পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া তথায় গঙ্গাতীরে কিছুকাল বাস করিলাম ও তথাকার যোগীগণের সহিত যোগালাপে

---

* রাজপুতনার Sanitary Hill Station হওয়ায়, তথায় গ্রীষ্মকালে রাজপুতানার ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিগণ ও তথাকার বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেশীয় নৃপতি ও ধনীগণ গমন করেন

কখনও বা যোগাভ্যাসে কিছুদিন অতিবাহিত করিলাম। এখানে জনৈক ব্রহ্মচারী ও দুইজন পার্ব্বতীয় উদাসীন সাধুর সহিত আমার পরিচয় হইলে আমি তাহাদিগের সহিত একত্রে টেহড়ী নামক স্থানে আসিলাম। টেহড়ীতে কতকগুলি সাধু ও তথাকার রাজ-পণ্ডিতগণের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল। ইহাঁদিগের পাণ্ডিত্যবিষয়ক যশঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ-পণ্ডিতগণ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন, যাহা আমি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। ইহাদিগের মধ্যে প্রধান রাজ-পণ্ডিত মহাশয় এক দিবস আমাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। যথানির্দ্দিষ্ট সময় আমি ও ব্রহ্মচারী, প্রেরিত লোকের সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইলাম। গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই এক অতীব ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিলাম যাহা ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কখন কোন সাধু-সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতের গৃহে দর্শন করি নাই। আমরা গৃহে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই দেখিলাম যে, জনৈক ব্রাহ্মণ কসাইয়ের কার্য্য করিতেছেন, অর্থাৎ তিনি মাংস কর্ত্তন করিতেছেন, গৃহাভ্যন্তরে কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম যে একস্থানে কতকগুলি পণ্ডিত স্তূপীকৃত পশুমাংস ও পশুমুণ্ড লইয়া বসিয়া আছেন। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা ও ক্ষোভ উপস্থিত হইল। যাহা হউক আমি গৃহস্বামী কর্ত্তৃক অতি সাদরে আহূত হইলেও, পাছে অধিকক্ষণ এ দৃশ্য দর্শন করিতে হয় এই আশঙ্কায় তাঁহার সহিত দুই একটি কথা কহিয়াই সত্বর বাটী ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে, সেই মাংসাহারী পণ্ডিত পুনঃ আমার নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন, "আহারার্থ প্রসাদ অর্থাৎ মাংসাদি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে ও ইহা আপনার আহার জন্যই আয়োজন করা হইয়াছে"। তিনি আমাকে তথায় গিয়া উক্ত প্রসাদ পাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, মাংস ভোজন করা দূরের কথা, মাংসের দৃশ্যই আমার চক্ষে ও মনে অত্যন্ত ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হয়, এজন্য আমাকে এ তদ্বিষয়ে ক্ষমা করিতে হইবে। যদি একান্তই আমাকে আপনারা আহারার্থে অনুরোধ করেন, তবে কৃপা করিয়া আমার জন্য কিছু অন্ন ও ফলমূল পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখানে আমার নিকট যে ব্রহ্মচারী আছেন, তিনি উহা পাক করিবেন। একথা শুনিয়া উক্ত মাংসভুক্ পণ্ডিত মহাশয় লজ্জিত হইয়া তাহাই করা যাইবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা শেষে তাহাই করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেও আমি টেহড়ীতে অবস্থান করিয়া ছিলাম এবং রাজ-পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ,জ্যোতিষ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থ যদি থাকে,সেইগুলি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম. আরও জিজ্ঞাসা করিলাম যে, উক্ত গ্রন্থগুলি উক্ত নগরে অন্য কাহারও নিকট পাওয়া যায় কিনা। আমি ইতঃপূর্ব্বে তন্ত্র—বিশেষতঃ বামাচারী তন্ত্র পাঠ করি নাই। রাজ-পণ্ডিত বলিলেন, এই সকল গ্রন্থ এখানে পাওয়া যায়। তখন আমি তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি তন্ত্র-গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিলাম। পরন্তু তাহাতে কতকগুলি অত্যন্ত ভয়ানক অশ্লীল বিষয় লিখিত ছিল—যাহা সভ্য জগতে প্রকাশ করা যায় না, বিশেষতঃ নায়িকা-সাধন ও মদ্য-মাংসাদি ভোজনের বৈধতা দেখিয়া উক্ত গ্রন্থসকলের প্রতি আমার যার পর নাই ঘৃণা ও বিরক্তি বোধ হইল। তাহা ছাড়া এই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ভূরি ভূরি ভ্রান্তি দেখিতে পাইলাম। বলিতে কি আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, উপরোক্ত জঘন্য কার্য্যগুলিকে কিরূপে আমার দেশীয় নবীন গ্রন্থকর্ত্তাগণ (যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ণ সত্যবেদ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন) ধর্ম্মের সাধন ও অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত করিতে লজ্জিত হন নাই। বিশেষতঃ দেবাদিদেব মহাদেবের নাম দিয়া এই সমস্ত ঘৃণিত কার্য্যকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। ইহাতে পঞ্চমকারাদি ও ভৈরবীচক্রাদি কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত, অশ্লীল ও অধর্ম্মযুক্ত। এই সমস্ত পুস্তকের পাঠ, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থী, অথবা চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী কাহারও উপযোগী নহে। ইহা যে ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী স্বার্থী ধূর্ত্ত মদ্যমাংসাদি-লোলুপ কদর্য্যাচারী লোকের লিখিত, তাহা আমি সেই গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

টেহড়ী হইতে আমি শ্রীনগরে যাত্রা করিলাম ও তথায় পৌঁছিয়া কেদার-ঘাটে একটি মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলাম। তথাকার পণ্ডিতগণের সহিত আমার বার্ত্তালাপ বা তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইলেই আমি তন্ত্রগ্রন্থের অসারতা ও অশ্লীল-তাদি দোষ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়া পরাস্ত করিতাম। এইস্থানে গঙ্গাগিরি নামক জনৈক সাধুর নাম, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অপরাপর প্রসিদ্ধির বিষয় শুনিলাম। এই সাধু বনমধ্যস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন ও তথা হইতে দিবাভাগে বাহির হইয়াও নিম্নস্থ স্থানে আসিতেন না। যাহা

হউক, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও ক্রমে আলাপ করিতে করিতে পরস্পর বন্ধুতা স্থাপিত হইল। তাঁহার সহিত আমার সম্মিলন উভয়ের পক্ষে সুখকর ও হিতকারী হইয়া উঠিল, কারণ তাঁহার সহিত আমার সর্ব্বদাই যোগ-বিদ্যা ও অন্যান্য অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা ও বিচার হইত। বস্তুতঃ আমি তাঁহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইলাম যে, সেইখানে আমি দুইমাসেরও অধিক অতিবাহিত করিলাম। তাহার পর গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হওয়ায় আমি আপন সঙ্গীগণ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ও দুইজন পার্ব্বতীয় (পাহাড়ী) সাধুর সহিত একত্রে কেদার ঘাট হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলাম এবং পথিমধ্যে রুদ্রপ্রয়াগাদি স্থান পর্য্যটন করিয়া অগস্ত্য-সমাধি (অগস্ত্যাশ্রমে) পৌঁছিলাম। তদনন্তর তথা হইতে আরও উচ্চস্থানে উঠিয়া, শিবপুরী নামক পর্ব্বতশৃঙ্গে শরৎ ঋতুর চারিমাস অতীত করিলাম। তৎপরে তথা হইতে উক্ত ব্রহ্মচারী ও দুইজন পাহাড়ী স্বামীর নিকট বিদায় লইয়া একাকী পুনঃ কেদার ঘাট হইয়া গুপ্ত কাশীতে আসিলাম। তথায় কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া গৌরীকুণ্ড ও ভীমগোফাদি পবিত্র তীর্থস্থান সকল দর্শন করতঃ, ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং অতি অল্পকাল তথায় অবস্থান করিয়া পুনঃ আমার প্রিয় নিবাসস্থান কেদার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে আমার পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মচারী ও পাহাড়ী সাধুদ্বয়ের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল। আমি কেদার ঘাটে আসিয়া মন্দিরের পাণ্ডা—যাঁহারা জঙ্গমসম্প্রদায়বিশিষ্ট সাধু, তাঁহাদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এই স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের কার্য্যকলাপ আমি অত্যন্ত মনোনিবেশসহকারে নিরীক্ষণ করিতাম এবং স্মরণযোগ্য ব্যাপারগুলিকে বিশেষ ধ্যানসহ স্মরণ করিয়া রাখিতাম। যখন আমি ইহাঁদের সমস্ত আন্তরিক বিষয় অবগত হইলাম তখন আমি নিকটস্থ হিমাচ্ছন্ন তুষারাবৃত পর্ব্বতমালায় প্রকৃত সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের সন্ধানার্থ পরিভ্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। দুরন্ত শীত ও সঙ্কটময় পাহাড়ী-পথের বিষয় চিন্তা করিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে সেই দেশবাসী লোকদিগকে মহাত্মা ও সাধু পুরুষদিগের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। যাহাকে যাহাকে মহাপুরুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বাস্তবিক কেহই তাঁহাদিগের প্রকৃত সন্ধান জানিত না, কেবল লোকমুখের কথা অথবা মিথ্যা গল্প করিয়া আমার

নিকট বড়াই দেখাইত; ফলতঃ এই প্রকারে তাহাদিগের কথায় নির্ভর করিয়া আমি বিংশতি দিবস পর্য্যন্ত দুরূহ পর্ব্বতে বৃথা পর্য্যটন করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলাম।. আমার সঙ্গে যে ২।৩ জন সঙ্গী জুটিয়া ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত শীতের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া ২।৩ দিন পরে আমাকে একাকী ফেলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। যাহা হউক, আমিও শেষে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ফিরিবার কালে তুঙ্গনাথশৃঙ্গে আরোহণ করিলাম।

তুঙ্গনাথশৃঙ্গস্থ একটি মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি দর্শন ও পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দিবসেই উক্ত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিলাম। অবতরণ-কালে আমি দুইটি পথ দেখিতে পাইলাম, তন্মধ্যে একটি পশ্চিমদিকে অপরটি নৈর্ঋত অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে প্রসারিত হইয়াছে। তখন আমি যে মার্গ গভীর জঙ্গলাভিমুখে গিয়াছে সেই পথটি অবলম্বন করিলাম এবং ঐ পথে চলিতে চলিতে এক নিবিড় জঙ্গল মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানের শুষ্ক অর্থাৎ বারিবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী (নালী) ও স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ শৈলখণ্ড সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিলাম। এইরূপ গভীর জঙ্গলমধ্যে পতিত হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, এখন আরও উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করা কর্ত্তব্য, না নিম্নদিকে অবতরণ করাই উচিত? পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, আরও উচ্চতর শিখরে আরোহণ করা বিশেষ বিঘ্ন-সঙ্কুল ও অসম্ভব, বিশেষতঃ তথায় জন-মানবের থাকিবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য আমি পার্ব্বত্য তৃণলতা ও গুল্মাদিকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া একটি শুষ্ক তটিনীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ তটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎপরে এক শৈলখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যখন চারিদিক নিরীক্ষণ করিলাম, তখন আমার দৃষ্টিতে মাত্র চারিদিকের অগম্য পর্ব্বত-শ্রেণী, উচ্চ উচ্চ টীলা ও অবিশ্রান্ত নিবিড় অরণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বিশেষতঃ সে সময় সূর্য্য অস্তগামী হইতে ছিলেন, এজন্য আমি ভাবিলাম, এই জনশূন্য স্থানে অধিকক্ষণ থাকা যুক্তিযুক্ত নহে ও এরূপ স্থান মানবের বা ঋষি-মুনির বাসস্থান হইতে পারে না। অতএব এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য।

আমার শরীর কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, গাত্রের বস্ত্র ছিঁড়িয়া ও কাটিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল ও পাদদ্বয়ও চলচ্ছক্তিরহিত

হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, আমি কোনরূপে বহুকষ্টে ঐ নিবিড় বন্যভূমি ও পর্ব্বত হইতে নিম্নে নামিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎকাল পরে বহুকষ্টে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তথায় সাধারণ গতায়াতের পথ প্রাপ্ত হইলাম। যদিচ সে সময় অত্যন্ত অন্ধকার ছিল, তথাপি আমি বহুচেষ্টা করিয়া প্রসিদ্ধ সাধারণ মার্গে কিছুদূর চলিয়া গিয়া কতকগুলি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলাম। তথাকার পর্ণকুটীর-বাসিগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা আমাকে বলিল যে, সেই পথ দিয়া উখিমঠ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। তদনুসারে চারিদিক অন্ধকারসমাচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও আমি সাধারণ মার্গ পরিত্যাগ না করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইয়া পরিশেষে উখিমঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তথায় উক্ত রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে যখন নিজকে পুনরায় সুস্থ বিবেচনা করিলাম, তখন উখিমঠ হইতে গুপ্তকাশীতে যাত্রা করিলাম। তথা হইতে উত্তর দিকে যাত্রা করিবার পর কিছুদূর গিয়া আমার মনে পুনঃ উখিমঠে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা হইল, কারণ আমি ভাবিলাম যে উখিমঠের আশপাশে পর্ব্বতগুহা-নিবাসী সাধুদিগের সঙ্গে কিছু আলাপ করা কর্ত্তব্য, এজন্য আমি পুনরায় উখিমঠে প্রত্যাগমন করিয়া তথাকার মঠধারী মহান্তের সহিত আলাপ পরিচয় করিলাম। আমি উখিমঠস্থ সাধু-চরিত্র অতি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সে স্থান বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত মিথ্যা-নামধারী কপটী পাষণ্ড ভণ্ড-তপস্বী সন্ন্যাসী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত খেদ উপস্থিত হইল যে,ধর্ম্মের ঘরে আজকাল কত কারচুপী চলিতেছে এবং অজ্ঞ ও বিদ্যাবুদ্ধিহীন লোকেরা, ইহাদিগের ভ্রমজালে পতিত হইয়া, অনর্থক নিজ নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া পাপ সঞ্চয় * করিতেছেন। যাহা হউক এই স্থানের মহান্ত (মঠধারী) মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে বারম্বার তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন ও আমাকে প্রলোভন দেখাইলেন যে, তাঁহার

* শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি যথার্থ দান-পাত্রকে বঞ্চিত করিয়া, ভণ্ডতপস্বী-আদিকে দান করা যায়, তবে সেই অজ্ঞ দাতা যথার্থ পাত্রকে বঞ্চিত ও অযথার্থ বা অধম লোককে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য নরকে পতিত হন। দেখ—মনুসংহিতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৯০—১৯৪।

মৃত্যুর পর আমিই উক্ত মহান্ত পদে অভিষিক্ত হইব এবং নগদ লক্ষ টাকারও অধিক মুদ্রার অধিপতি হইতে পারিব, তাহা ছাড়া অপর যে সকল ভূসম্পত্তির আয় ও অন্যান্য প্রকারে ঐ গদীর আয় আছে, তাহারও আমি মালিক বা কর্ত্তা হইব, ইত্যাদি অনেক প্রলোভনসূচক প্রস্তাব আমার নিকট উপস্থিত করিলেন। আমি তাঁহাকে সাদা কথায় সরলভাবে উত্তর দিলাম যে, যদি আমার পার্থিব সম্পত্তির ভোগেচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কদাপি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ কষ্টকর পথে আসিতাম না। আমার পিতৃ-সম্পত্তি, আমি যথাকালে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হইলে তাহা আপনার যাবতীয় মঠ-সম্পত্তি অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা ন্যূন হইত না। আমার এই উত্তর শুনিয়া মহান্ত মহারাজ আমাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল যদি তোমার বাস্তবিক এরূপ পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, তবে কি দুঃখে, তুমি এই মহান্ কষ্টকর ব্রতে ব্রতী হইয়াছ? আমি তদুত্তরে বলিলাম যে, আমি পার্থিব সুখসম্পত্তি উপভোগের নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করি নাই, পরন্তু কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগদ্বারা নিগূঢ় পরমাত্ম-জ্ঞান উপার্জ্জিত হইলে, আমি কে? আমার দেহই বা কি? আমি কি জন্যই বা দেহ ধারণ করিয়াছি? ও কি জন্যই বা আমি দেহধারণ করিয়া বার বার ত্রিতাপ ভোগ করিয়াছি? এবং কিরূপেই বা আমি নিজস্বরূপের সহিত পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ত্রিতাপ হইতে ত্রাণ পাইয়া মৃত্যুকে জয় করতঃ পরমপদ মোক্ষ বা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে সমর্থ হইব?—এই সমস্ত যাহাতে সমাধান করিতে পারি, তজ্জন্য আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি। আমি আরও বলিলাম, সত্য, যোগ, বিদ্যা ও মোক্ষলাভ বিনা নিজ আত্মার পবিত্রতা সত্য ও ন্যায়াচরণ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে ও নিজ উন্নতি সাধনের সহিত অন্য স্বদেশবাসীগণের যাহাতে অবিদ্যা নষ্ট হয় ও তাহারাও সত্য পথ অবলম্বন করিয়া কৃত্যকৃত্য হয়, তাহার জন্যও আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার এই সমস্ত কথা শুনিয়া মহান্ত মহাশয় বলিলেন যে, ইহা অতি উত্তম কথা তোমার সাধু সংকল্পকে আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তখনও তাঁহার মন হইতে আমাকে নিজ শিষ্য করিবার ইচ্ছা দূরীভূত হয় নাই, এজন্য তিনি আমাকে অন্ততঃ আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন ও অনুরোধ করিলেন। যাহা হউক, আমি এ বিষয়ে আর কোন উত্তর না দিয়া

পরদিবস প্রাতেই জোশীমঠে যাত্রা করিলাম। এই জোশীমঠে আমি অনেক শাস্ত্রী, সন্ন্যাসী ও যোগীদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া যোগবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা ও নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলাম।

জোশীমঠে কিছুদিন থাকিয়া পরে আমি বদরীনারায়ণের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। রাওলজী তথাকার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ইনি একজন পণ্ডিত লোক। ইহাঁর সহিত যে কয়েকদিন বাস করিয়া ছিলাম, তৎকালে আমি বেদ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতাম ও তাঁহার সহিত আমার খুব বাদানুবাদ হইত। যাহা হউক আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সন্নিকটে কোন যোগী-মহাত্মা থাকেন কি না? তিনি বলিলেন, এখানে প্রকৃত যোগীর দর্শন অসম্ভব। একথা শুনিয়া আমি অন্য স্থান পর্য্যটনে কৃতসংকল্প হইলাম। তিনি একথা বলিয়াছিলেন যে, প্রকৃত যোগীরা কখন কখন উত্তরাখণ্ডে আসিয়া থাকেন। এক দিবস প্রাতে আমি যোগীজনের অনুসন্ধান করিতে করিতে অলকানন্দার তটে উপস্থিত হইলাম। উক্ত নদীর অপর পারে যাইতে ইচ্ছা করিলাম না, কারণ উক্ত নদীর অপর পারে "মাংস" নামক এক বড় গ্রাম আছে, এজন্য ঐ নাম শুনিয়াই আমি অপর পারে না গিয়া অলকানন্দার উৎপত্তি স্থল দেখিবার অভিপ্রায়ে, অতি সঙ্কটপূর্ণ তুষারাবৃত পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যে স্থান অলকানন্দার উৎপত্তিস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তথায় যখন উপস্থিত হইলাম, তখন, আর কোন দিকেরই পথ দৃষ্টিগোচর হইল না এবং তখন কি করিব, কোন দিকে যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তৎপরে মার্গ অন্বেষণার্থ নদীর অপর পারেই গমন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। আমার গাত্রে অতি সামান্য বস্ত্র ছিল, এজন্য ঐ দুঃসহ শীতে আমার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শীত অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া পড়িল। এক দিকে শীতের চোটে অস্থির, অপর দিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলাম। কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে, এক খণ্ড বরফ আহার করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের চেষ্টা করিলাম, পরন্তু তদ্দ্বারা উহা নিবৃত্ত হইল না। শেষে অলকানন্দার অপর পারে যাইবার জন্য উহাতে অবতরণ করিলাম। এই নদীতে কোন কোন স্থানে অত্যন্ত গভীর জল এবং কোথাও বা অতি অল্প জল থাকে। এই স্থানে উক্ত

নদী প্রস্থে ১০ হাত মাত্র ছিল। এই নদীর তীর ভূমি সূক্ষ্মধারাল বরফ খণ্ডদ্বারা সমাবৃত ছিল। এই সূক্ষ্মধার বরফ খণ্ডের আঘাতে আমার নগ্ন পদতলদ্বয় অত্যন্ত আহত হওয়ায় তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। অসহ্য শীতে পাদদ্বয়ও অসাড় শূন্যবৎ হইয়া গেল এবং তখন আমার শরীর প্রায় চেতন-রহিত হইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, আমি কোন প্রকারে অতীব ক্লেশ সহ্য করিয়া অলকানন্দার অপর পারে উপনীত হইলাম, এবং তখন আমি উর্দ্ধাঙ্গের সমস্ত বস্ত্র একত্রিত করিয়া জানু হইতে পাদ পর্য্যন্ত ক্ষত স্থান গুলি বন্ধন করিলাম ; কিন্তু এরূপ করিলেও আমার এক পাদও অগ্রসর হইবার শক্তি রহিল না। এরূপ অবস্থায় অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। সে সময় কাহারও তথায় আসিবার আশা ছিল না, কাজেই আমি তখন বিবশ হইয়া এক ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এক মনে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলাম। পরন্তু ঈশ্বরের কি অনুপম মহিমা ! হঠাৎ সেই স্থানে দুইজন পার্ব্বতীয় পুরুষ ঘটনাক্রমে আমার দিকে চলিয়া আসিতেছে দেখিলাম ও তাহারা উভয়েই আমার সমীপে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল ও বলিল ভগবন্ ! আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়া আহারাদি করুন। যখন আমি তাহাদিগকে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, তখন তাহারা বলিল, আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিলে আমরা তথা হইতে আপনাকে সিদ্ধপদ নামক তীর্থে পৌঁছাইয়া দিব। যাহা হউক, আমার মনে তখন এক বিচিত্র ভাব উদয় হইল এবং আমি আর তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, পরন্তু আমি তোমাদিগের কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিতেছি না, কারণ আমাতে এরূপ শক্তি নাই যে, আমি এক পাদও অগ্রসর হইতে পারি। যদিও তাহারা আমাকে তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল, পরন্তু আমি স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহাদিগের সঙ্গে বা পশ্চাতে চলিয়া যাইবার আমার আদৌ শক্তি ছিল না বা সাহসও হইল না। তাহাদিগকে আমি স্পষ্ট বলিলাম, আমার যেরূপ শারীরিক দশা ঘটিয়াছে, তাহাতে বরং আমার পক্ষে নড়িবার প্রযত্ন করা অপেক্ষা, মরিয়া যাওয়া শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। তৎপরে আর আমি তাহাদিগের সহিত কোনরূপ কথা বলিলাম না ও মনকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলাম। অগত্যা তাহারা চলিয়া গেল ও বনমধ্যে মিশিয়া গেল, যাহা

হউক, আমার অন্তরে জ্ঞান-পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, এজন্য সে সময় মৃত্যু কামনা পরিত্যাগ করিলাম ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি ফিরিয়া গিয়া নিজ পাঠে স্থির থাকিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত। যাহা হউক কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমার শরীরে কিছু বল সঞ্চার হইল ও আমি তখন ধীর-পদ-বিক্ষেপে বসুধারা নামক পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইলাম। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সংগ্রাম নামক নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় বদরিনারায়ণের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; মন্দির স্বামী রাওলজী আমাকে দেখিবা মাত্র বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও বলিলেন—"তুমি সমস্ত দিন আজ কোথায় ছিলে" ? তখন আমি তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলাম। পরে রাত্রিতে কিছু আহার করিয়া ঐ মন্দিরেই শয়ন করিলাম। শ্রমবশতঃ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়া রাওয়ালজীর নিকট বিদায় লইয়া রামপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথমধ্যে সায়ংকালে এক যোগীর আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইনি মহান্ তপস্বী (তপস্যাসম্পন্ন) ছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার আশ্রমেই রহিলাম। এই পুরুষ জীবিত ঋষি ও সাধুগণের মধ্যে উচ্চ কোটির ঋষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই মহাত্মার সহিত ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আমি নিজ সংকল্পকে মনে মনে দৃঢ় রাখিয়া পর দিবস প্রত্যূষেই পুনঃ রামপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথমধ্যে কয়েকটি বন ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চিল্কাঘাটী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, শেষে আমি রামপুর আসিয়া পৌঁছিলাম ও রামগিরি নামক এক প্রসিদ্ধ যোগী ও সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া. তথায় কিছু কাল বাস করিলাম। এই সাধুর পবিত্রাচার ও আধ্যাত্মিক জীবনধারণ জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল এবং তাঁহার এক বিচিত্র স্বভাব (প্রকৃতি) ছিল। তিনি কখন নিদ্রিত হইতেন না। সমস্ত রাত্রি জাগরিত থাকিয়া কখন উচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেন, কখন চীৎকার ও কখন বা রোদন করিতেন। রামগিরি রাত্রিকালে যখন উচ্চস্বরে কথোপ-কথন করিতেন, তখন তিনি নিজে নিজেই যেন উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন, এরূপ প্রতীত হইত। আমি কয়েকবার তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে শুনিয়া ছিলাম। তিনি যখন এইরূপ করিতেছিলেন, এমন সময় আমি তাঁহার

কামরা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম,তিনি, একাকীই তথায় বসিয়া আছেন, অন্য কোন পুরুষকে তথায় দেখিতে পাই নাই। আমি এইরূপ বার্ত্তালাপ শুনিয়া বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছিলাম ও তৎপরে তাঁহার শিষ্যগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে, স্বামীজির প্রকৃতিই এইরূপ। * তিনি একাকী থাকিলেও আপনা আপনি ঐরূপ চীৎকারাদি করিতে ক্রটী করেন না। আমি এই রামগিরি সাধুর সহিত কয়েকবার একান্তে যোগ-বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, উক্ত গিরি মহাশয় যোগ-বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ হইতে পারেন নাই। তবে তিনি যে কতক কতক সাধন করিয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

যাহা হউক রামগিরি মহাশয়ের নিকট হইতে যোগ-বিষয়ক কিছু বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিয়া আমি তথা হইতে কাশীপুরে যাত্রা করিলাম ও সেখান হইতে দ্রোণসাগরে পৌছিয়া তথায় সমগ্র শরৎ ঋতু অতিবাহিত করিলাম। প্রথমে হিমালয় পর্ব্বতরূপ পবিত্র স্থানে গিয়া দেহ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য এরূপ মনে মনে ইচ্ছা করিয়া ছিলাম, পরন্তু তৎপরেই মনে মনে বিচার করিলাম যে সত্যজ্ঞান প্রাপ্তির পর শরীর ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দ্রোণ-সাগরে সমগ্র শরৎ ঋতু অতিবাহিত করিয়া পরে মুরাদাবাদ যাত্রা করিয়া তথা হইতে সম্বল নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সম্বল হইতে গড়মুক্তেশ্বর পৌছিয়া পুনঃ তথা হইতে ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইলাম।

তৎকালে আমার নিকট অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত হঠ-যোগ-প্রদীপিকা, যোগবীজ, শিবসন্ধ্যাদি যোগগ্রন্থ ও কেশরাণী সঙ্গতি আদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অস্ত্রচিকিৎসার গ্রন্থ থাকিত। এই সকল গ্রন্থগুলি সে সময় ভ্রমণ কালে আমি সর্ব্বদাই পাঠ করিতাম। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষতঃ একটি পুস্তকে নাড়ীচক্রবিষয় বিশেষ বর্ণিত ছিল। ইহাতে এমন বিস্তৃতভাবে নাড়ীচক্র বর্ণিত ছিল যে, তাহার সমস্ত পাঠ করিতে বিরক্তি আসিত এবং সেইগুলি বিশেষরূপে পাঠ করিয়া কয়েকটি বিষয় পূর্ণতয়া নিজবুদ্ধিতে ধারণ করিতে

---

* আমাদের ধারণা যে, উক্ত স্বামীজী যোগভ্যাস করিতে গিয়া প্রাণায়ামাদির নিয়ম ব্যতিক্রম করায় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি খুব সম্ভব খেয়াল ভরে কথাবার্ত্তা কহিতেন।

পারিতাম না ও তাহা আমার সত্য বলিয়া প্রতীতি হইত না, এমন কি সেই গুলি পরের পর স্মরণ রাখাও অসম্ভব ছিল। প্রত্যুত আমার চিত্তে কয়েকটি বিবরণ-বিষয়ে বিশেষ সংশয় উত্থাপিত হইয়াছিল। এ জন্য এগুলি বাস্তবিক সত্য কি মিথ্যা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিরাকরণ জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতাম। এক দিন দৈবযোগে নদীগর্ভে একটী শব ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাকে টানিয়া তীরে উঠাইলাম ও নিজ সংশয় বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া উক্ত শবদেহ উত্তমরূপে কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার হৃদয়পিণ্ডকে বাহির করিয়া ও ধ্যানপূর্ব্বক উক্ত হৃদয়-পিণ্ডের সহিত গ্রন্থলিখিত বর্ণনা সকলের ঐক্য হয় কি না, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। এইরূপে শিরঃ ও গ্রীবাভাগ কর্ত্তন করিয়া তাহার সহিত গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলির মিলাইতে লাগিলাম। সেই শবদেহের অঙ্গচ্ছেদন করিয়া পুস্তক সম্মুখে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, উক্ত শবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত গ্রন্থ-বর্ণিত নাড়ীচক্রের নিদর্শন নাই, তখন বুঝিলাম এই গ্রন্থগুলি আপ্তকর্ত্তৃক লিখিত নহে ও ইহার বিবরণও সত্য নহে, এজন্য উক্ত কর্ত্তিত মৃতদেহের সহিত ঐ সকল বাজে যোগ-গ্রন্থগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নদী-বক্ষে নিক্ষেপ করিলাম। সেই সময় হইতেই আমি মনে মনে বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম ও আমার মনে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল যে, বেদ, উপনিষৎ, পাতঞ্জল ও সাংখ্য-দর্শনাদি আপ্তকৃত গ্রন্থ ভিন্ন অপরাপর ইতর গ্রন্থে যোগবিষয়ক যাহা কিছু অধিক বর্ণিত আছে, তৎসমুদায় বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং কপোল-কল্পিত।

এই ঘটনার পর কিছুদিন গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ফরক্কাবাদ নামক নগরীতে উপস্থিত হইলাম। ফরক্কাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া শৃঙ্গিরামপুর পৌঁছিয়া তথা হইতে ছাউনী অর্থাৎ ক্যান্টন্‌মেণ্টের পূর্ব্বদিকের পথ দিয়া ১৯১২ বিক্রমাব্দের শেষে কানপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়া অল্পসময় মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইলাম।

সংবৎ ১৯১৩ সালের পাঁচ মাসের মধ্যে আমি কানপুর হইতে প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী অনেক প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়া ছিলাম। প্রয়াগে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ছিলাম। ভাদ্রপদের প্রারম্ভেই আমি মির্জ্জাপুর আসিলাম ও তথা হইতে বিন্ধ্যাচলে গিয়া অশোলজীর মন্দিরে বাস

করি। পরে বিন্ধ্যাচল হইতে যাত্রা করিয়া আশ্বিনের প্রারম্ভেই ৺কাশীধামে পৌঁছিলাম। * কাশীতে গঙ্গা-বরুণা-সঙ্গমের নিকট একটী গুহায় ভবানন্দ-সরস্বতীনামক গুজরাট দেশীয় এক ধার্ম্মিক পুরুষ বাস করিতেন। উপরোক্ত ভবানন্দের মাতাজী খ্যাতা বিদুষী কন্যা ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর তথায় থাকিতেন। থিওজফিক্যাল সোসাইটীর কর্ণেল্ অল্‌কট্ ও ম্যাডাম্ ব্লেভাটস্কী এই মাতাজীকে পূর্ণ যোগিনী বলিয়া খ্যাত করেন ও তৎপরে অনেক Theosophist যথা শ্যামভট্ট আদি তথায় নূতন গুহা প্রস্তুত করিয়া বাস করিয়াছিলেন। আমরা যত দূর জানি, মাতাজী বিদূষী স্ত্রী ছিলেন, পরন্তু যোগী বা adept ছিলেন না। অথবা কাশীর লোকেরা তাঁহাকে সেভাবে গ্রহণ করিত না বা করে নাই। তবে Theosophist দিগের চক্ষে তিনি বিশেষ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

কাশী হইতে যাত্রা করিয়া চণ্ডালগড়ে বা (চুনারে) পৌঁছিয়া দুর্গাযুতের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। আমি এই স্থানে দশদিন মাত্র অবস্থান করি। ঐ সময় আমি যোগসাধন, স্বাধ্যায় ও অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধপান করিয়াই জীবন-ধারণ করিতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সে সময় বিজয়া (সিদ্ধি) পানে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, একারণ কয়েকবার নেশায় অভিভূত হইয়া মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে পারিতাম না। † যাহা হউক, চণ্ডালগড়নিকটস্থ কোন পল্লীর এক শিবালয়ে এক দিন রাত্রি যাপনার্থ উপস্থিত হইয়া ছিলাম। সিদ্ধিপান জন্য

* কাশীতে আমি গঙ্গা-বরুণাসঙ্গমের নিকট একটী গুহার ভিতর বাস করি—যাহা সে সময় ভবানন্দ সরস্বতীর অধিকারে ছিল। এই স্থানে কয়েকজন গুর্জ্জরদেশীয় শাস্ত্রীর সহিত—যথা কাকারাম শাস্ত্রী ও রাজারাম আদির সহিত পরিচয় হয়, এখানে কেবল মাত্র আমি ১২ দিন অবস্থান করি।

† আমাদিগের দেশীয় অনেক সাধু-সন্ন্যাসীগণ সিদ্ধি গাঁজা আদি মাদক দ্রব্য সেবন করেন ও তাঁহারা বলেন যে, ইহা সেবন করিলে চিত্তের একাগ্রতা হয় ও নিত্য নূতন স্থানের জল লাগে না অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানের জল-ব্যবহারে পীড়াদি জন্মে না। পরন্তু এ কথা মিথ্যা, কারণ যদ্দ্বারা বুদ্ধির লোপ হয়, তাহাকেই মাদক দ্রব্য বলা যায় ও সেই মাদকদ্রব্যে মস্তিষ্ককে বিকৃত করিয়া দেয়। "বুদ্ধিং লুম্পতি যৎদ্রব্যং মদকারী তদুচ্যতে" সুতরাং ইহা সাধুরা নেশারই বশীভূত হইয়া সেবন করেন। যোগসাধনে মাদকদ্রব্য খাওয়া নিষেধ।

মাদকতাবশতঃ তথায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীর, আমার বিবাহসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইতেছে। এই স্বপ্ন দেখিবামাত্র আমি জাগরিত হইলাম; সে সময় বৃষ্টি পড়িতেছিল সুতরাং মন্দিরের বারান্দায় প্রবিষ্ট হইলাম, তথায় বৃদ্ধ দেবতা নন্দী (বৃষের) একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল।

আমি আমার পুস্তকাদি উক্ত নন্দীর পৃষ্ঠে রাখিয়া তৎপশ্চাতে উপবিষ্ট হইলাম। সহসা আমার দৃষ্টি নন্দীমূর্ত্তির অভ্যন্তরে পড়িল। তথায় দেখিলাম, একজন মনুষ্য বসিয়া আছে, আমি হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র সে ভয়ে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিল। আমি তখন সেই সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া উক্ত শূন্যগর্ভ মূর্ত্তির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করিলাম। প্রাতঃকালে এক বৃদ্ধা তথায় আসিল, তখন আমি ঐ বৃষদেবতার অন্তরে বা উদর মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। সে আমাকে সত্য বৃষ বা নন্দীদেহ মনে করিয়া চলিয়া গিয়া কিছু দধি ও গুড় সহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমার পূজার্থে উক্ত দ্রব্য আমার সম্মুখে নিবেদন করিল ও বলিল "হে দেব! আপনি ইহা গ্রহণ করুন ও ইহা সেবন করিতে আজ্ঞা হউক।" আমি তৎকালে ক্ষুধার্ত্ত থাকায় সেগুলি সমস্তই স্বাহা করিয়া দিলাম অর্থাৎ সমস্তই খাইয়া ফেলিলাম। এই দধি বিশেষে অম্লরস-বিশিষ্ট থাকায়, উহা পানে আমার বিশেষ উপকার বোধ হইল, কারণ তদ্দ্বারা আমার মাদকতা—যাহা তখনও কিঞ্চিৎ মাত্র ছিল, তাহা একবারে তিরোহিত হইল। আমি বিশেষ সুস্থ বোধ করিলাম।

সংবৎ ১৯১৪ বিক্রমাব্দীয় চৈত্রমাসে আমি নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান (অর্থাৎ যে স্থল হইতে নর্ম্মদা প্রবাহিত হইয়াছে, সেই স্থান) দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এই যাত্রাকালে আমি কাহারও নিকট পথ-বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই, মাত্র দক্ষিণদিকে চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে শীঘ্রই এক ঘনীভূত জঙ্গল মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই বনে ছোট ছোট কণ্টকাবৃত জঙ্গল ও মধ্যে মধ্যে কোথাও বা লোক পরিত্যক্ত অর্দ্ধভগ্ন-পর্ণকুটীর দৃষ্টিগোচর হইল। কোন কোন স্থানে পৃথক্ পৃথক্ পর্ণকুটীরও দৃশ্যমান্ হইল। এই সমস্ত পর্ণকুটীরে লোক বাস করিত। আমি তাহারই একটি পর্ণকুটীরে বসিয়া কিছু দুগ্ধ পান করিলাম। তৎপরে পুনঃ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে আমি এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে আর কোন প্রসিদ্ধ মার্গ দেখা গেল না। তখন

আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, যদি বন্যদিগের যাতায়াতের মার্গ পাই, তবে তন্মধ্যে যেটি পছন্দ হইবে, সেই মার্গ দিয়াই গমন করিব। যাহা হউক, আমি এইরূপ একটি মার্গ ধরিয়া চলিতে চলিতে এক নির্জ্জন বনে প্রবিষ্ট হইলাম। সেই জঙ্গল ছোট ছোট বদরীবৃক্ষের ঝাটীতে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানকার ঘাস এত ঘন ও উচ্চ ছিল যে, তন্মধ্যে আর কোন পথ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। এ সময় হঠাৎ আমার সম্মুখে এক বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক উপস্থিত হইল। এই পশু আমাকে দেখিবামাত্র অতি উচ্চস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল ও পশ্চাতের পাদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মুখব্যাদন করতঃ, আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত আমি নিষ্ক্রিয় ও স্তম্ভবৎ দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম এবং নিজহস্তস্থিত মোটা দণ্ডটী তাহার দিকে তুলিলাম। তৎপরে সে শনৈঃ শনৈঃ এই দেখিয়াই ভয়ভীত হইয়া প্রথমে পশ্চাৎপদ হইল ও পরে পলাইয়া গেল। যাহা হউক, তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জন এরূপ ভয়ানক যে, উক্ত শব্দ শ্রবণ করিয়া সমীপস্থ লোকেরা— যাঁহারা আমায় তাহাদিগের গ্রাম দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, লাঠী-সোঁটা ও শিকারী কুকুরের সহিত আমার প্রাণরক্ষার্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমাকে এই ভয়ানক সঙ্কটময় স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, আমি আরও যত অগ্রগামী হইব, ততই আমাকে ইহাপেক্ষা সঙ্কটে পতিত হইতে হইবে, কারণ এই পর্ব্বতময় বনে বিস্তর ক্রূর হিংস্রক বন্যপশু বাস করে, অর্থাৎ এই বনে ভল্লুক-বন্যহস্তী-ব্যাঘ্র-বন্যশূকরাদি বিবিধ প্রকার জন্তুর বাস, অতএব নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেই তাহাদিগের সম্মুখীন হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, আপনারা কৃপা করিয়া প্রত্যাগত হউন, আমার কুশল জন্য আপনারা এতদূর ভাবিত ও ভীত হইবেন না। কারণ আমি নিজকে পরম কল্যাণময় পরমাত্মার কুশল ও রক্ষায় রক্ষিত মনে করি। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, আমি কোন মতেই প্রত্যাগত হইব না ও নিশ্চয়ই অগ্রসর হইব, তখন তাঁহারা আমার আত্মরক্ষার্থে আমার হাতের যষ্টি অপেক্ষা আর একটী মোটা যষ্টি দিলেন। আমি তাহা ভদ্রতার অনুরোধে গ্রহণ

করিয়া পরে তাহাও ফেলিয়া দিলাম। আমার মনে তখন এই দৃঢ়ধারণা ছিল যে, অদৃষ্টে যাহা আছে হউক, পরন্তু আমাকে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতেই হইবে। এজন্য আমি তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া ক্রমশঃআরও গভীর বনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর ঘোর অন্ধকার উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। গমনকালীন সম্মুখে কোন মনুষ্যের বসতি দৃষ্টিগোচর হইল না; দূরেও আর কোন গ্রামাদি দেখিতে পাইলাম না। কোন জঙ্গলী মনুষ্যও আমার সম্মুখে পড়ে নাই। আমার সম্মুখে কেবল বিস্তৃত অরণ্যময় স্থলই পড়িয়াছিল। মাত্র স্থানে স্থানে বন্যহস্তী-উৎপাটিত বৃক্ষ ও ভগ্নবৃক্ষশাখা দেখিলাম। তাঁহাতে বোধ হইল যে, ইতঃপূর্ব্বে এইস্থান দিয়া বন্যহস্তীর দল চলিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বন্য বদরী ও অন্যান্য কণ্টকময় বৃক্ষের ঝোপ এত ঘনীভূত ছিল যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব ও অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতে ছিল। কণ্টকাঘাতে আমার দেহের নানা স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে আমি এমন একস্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, সেই কণ্টকময় ঝোপের মধ্য দিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বোধহইল। যাহা হউক তখন আমি গুড়ি মারিয়া, কোথাও বা সর্পবৎ লম্বায়মান হইয়া আছড়াইয়া কামড়াইয়া কোন গতিকে সেই কণ্টকাবৃত স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। এই দিগ্বিজয় প্রাপ্ত হইবার জন্য, আমি সমস্ত পরিধেয় বস্ত্রগুলিকে টুকরায় পরিণত করাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম ও আমার শরীরের কোন কোন স্থানের মাংসের টুকরা বা অংশ পর্য্যন্তও ভেট দিতে হইয়াছিল। বলিতে কি যখন আমি সেই কণ্টকময় স্থান অতিক্রম করিলাম, তখন আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও অর্দ্ধমৃত্যুবৎ অবস্থা ঘটিয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিল, তখন আর অন্ধকার ছাড়া আমার কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। যদ্যপি সেখানে কোন মার্গের নিদর্শনই ছিল না, তথাপি আমি আরও অগ্রে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি মনে করিলাম যে, চলিতে চলিতে অবশ্যই কোন না কোন পদমার্গ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইব। এরূপ ভাবিয়া আমি ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শেষে আমি এমন এক স্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম যেখানে চারি উচ্চ শৈলখণ্ড ও পর্ব্বত ছিল। যাহাতে বিবিধ প্রকার ওষধি ও বনস্পতি বিরাজিত ছিল, পরন্তু সেই স্থান দেখিয়া বোধ হইল

যে তথায় বা তাহার সন্নিকটে অবশ্যই মনুষ্যের বাস আছে বা থাকা সম্ভব। এমন সময় আমি অদূরে এক আলোক দেখিলাম এবং উহা যে মনুষ্য-নিবাসের নিদর্শন, তাহাও বুঝিলাম। সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া বহুকষ্টে অন্ধকারে গমন করতঃ শেষে গুটিকতক ছোট ছোট পর্ণকুটীর দেখিলাম, তাহার চারি-পার্শ্বে গোময় স্তূপাকারে পড়িয়াছিল এবং উক্ত পর্ণকুটীরের মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া প্রদীপের আলোকও দেখিতে পাইলাম। নিকটে একটি ছোট স্বচ্ছজলযুক্ত স্রোতস্বিনী বহিতেছিল ও তাহার পার্শ্বে ছাগাদি পশু চরিতেছিল। তথায় পৌঁছিয়া এক বিশাল বৃক্ষের ডালে উপবিষ্ট হইলাম। তথাকার লোকেরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার যথোচিত সৎকার করিল। তাহারা আমার পানার্থ দুগ্ধ আনয়ন করিল ও সমস্ত রাত্রি আমার রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, যার পর নাই আতিথেয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। প্রাতঃ-কালে উঠিয়া আমি উক্ত নদীজলে নিজ ক্ষতবিক্ষত শরীর, পদ ও হস্তস্থিত দণ্ডসোঁটা প্রক্ষালন করিলাম। যখন সন্ধ্যোপাসনায় উপবেশন করিতেছি, তখন যেন কোন বন্যজন্তুর গর্জ্জন শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। পরে মনোযোগ দিয়া যখন শুনিলাম, তখন ঐ শব্দ টমটমরূপ উচ্চশব্দের ন্যায় প্রতীত হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, এক বড় শ্রেণীবদ্ধ যাত্রীদল আসিতেছে। সেই দলে অনেক স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালক ছিল, তৎপশ্চাৎ অনেক গো ও ছাগাদি পশুগণ একটী পর্ণকুটির হইতে বহির্গত হইল। বোধ হইল যে, ইহারা কোন দূরস্থ দেবস্থানে পূজোপলক্ষে যাইতেছে। দিবাবসান হওয়ায় গত রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়াছিল। যখন তাহারা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তথায় একজন বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুজী! আপনি কোথা হইতে এখানে আসিলেন? আমি বলিলাম যে, আমি কাশী হইতে আসিতেছি ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান দর্শ-নার্থ যাত্রা করিতেছি। একথা শুনিয়া সেই যাত্রীর দল চলিয়া গেলেন। আমি নিজ সন্ধ্যোপাসনাদি করিতেছি, এমন সময় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে উক্ত বৃদ্ধের একজন অধ্যক্ষ দুইজন পাহাড়ী সঙ্গে লইয়া আসিল ও তাহাদিগকে আমার এক পার্শ্বে বসাইয়া দিল। সন্ধ্যোপাসানার পর আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লাম, তোমারা কিজন্য আমার নিকট বসিয়া আছ? তখন অধ্যক্ষ বলিল, আপনি

কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের পর্ণকুটীরে আসিয়া অবস্থান করুন, আমরা আপনার জন্য ভোজনের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিব। আমি বলিলাম যে, আমি অন্নাদি ভোজন করি না, একমাত্র দুগ্ধপান করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করি ও আমি এই বৃক্ষতলেই অবস্থান করিব। তথন সেই অধ্যক্ষ তাঁহার লোকদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, স্বামীজীর জন্য দুগ্ধের আয়োজন কর। আমি তাহাদিগকে নিজ তুম্বা প্রদান করিলাম—যাহা তাহারা লইয়া গিয়া দুগ্ধপূর্ণকরতঃ আমার নিকট প্রত্যাগত হইল। আমি সেই দুগ্ধ পান করিলাম ও রাত্রিতেও পুনঃ দুগ্ধ পান করিয়া তথায় অবস্থান করিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার লোকদিগকে রাত্রিতে আমার রক্ষার্থ নিয়োজিত করিলেন ও তাহারা আমার চারিদিকে রাত্রিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া জাগরিত রহিল। যাহা হউক, আমি উক্ত প্রহরী-দ্বয়ের চৌকীতে থাকিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। অতি প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক আমি একাকী নিজপথে অগ্রসর হইয়া শেষে নর্ম্মদাতটে পৌছিলাম। এই নর্ম্মদাতটে আমি প্রায় পূর্ণ তিনবৎসর সাধু সঙ্গে ও অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত করি। এই নর্ম্মদাতটে আমি শুনিলাম যে, বিরজানন্দ নামক একজন দণ্ডী-স্বামী অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্ ও বৈদিক পণ্ডিত; তিনি মথুরায় বাস করেন। এ কথা শুনিয়া আমি তথা হইতে তদভিমুখে যাত্রা করিয়া সংবৎ ১৯১৭ বিক্রমাব্দে মথুরায় পৌছিলাম, তখন আমার বয়স আন্দাজ ৩৯ বৎসর। এখানে আমি শ্রী১০৮ * স্বামী বিরজানন্দের সহিত সম্মিলিত হই। এই মহাপুরুষের সামান্য সংক্ষিপ্ত জীবনবিবরণ আবশ্যক বিধায় এস্থলে বর্ণন করিতেছি। পরিশিষ্টে ইঁহার বিস্তৃত জীবনী দেওয়া হইবে। পঞ্জাব দেশে কর্ত্তারপুরের সন্নিকট বিয়াসা নদীর তটে গঙ্গোপুর নামক গ্রামে সংবৎ ১৮৫৪ বিক্রমাব্দে ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় শারদশাখান্তর্গত সারস্বত ব্রাহ্মণ নারায়ণ দত্তের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রজ্ঞাচক্ষু ছিলেন †। ইনি সর্ব্বপ্রকার বেদবেদাঙ্গাদির

---

* বড় বড় রাজা সাধু মহাত্মা ও বন্দনীয় পুরুষের নামের পূর্ব্বে ১০৮ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহাদের বন্দনা শ্রীশ্রীশ্রী ইত্যাদি ১০৮ বার। অনেকে এই সংখ্যা মালাতে জপ করেন, কেননা তাঁহার নাম এরূপ বন্দনীয় যে, তাহা ১০৮বার জপা উচিত।

† চক্ষুহীন অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াও যাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যারূপী চক্ষু বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলে।

স্বাধ্যায় করিয়াছিলেন ও ইঁহার ন্যায় মহান্ বেদাচার্য্য তৎকালে ভারতবর্ষে অন্য কেহ ছিল না। ইঁহাকে কেহ কেহ অলওয়র স্বামীও বলিতেন। ইনি মথুরাবাসের পূর্ব্বে আলবর মহারাজ মহাশয়ের রাজ-দরবারে থাকিতেন। যে সময় স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৮০।৮১ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার বেদ ও আর্য্যগ্রন্থে বিশেষ রুচি ছিল এবং আধুনিক কৌমুদীশেখর আদি নবীন গ্রন্থে বড়ই অশ্রদ্ধা ছিল। ভাগবতাদি পুরাণকে তিনি অপ্রামাণিক বলিয়া তিরস্কার করিতেন। স্বামী দয়ানন্দ গ্রীষ্ম ঋতুতে মথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া রঙ্গেশ্বরের মন্দিরে অবস্থান করিলেন, কয়েক দিবস অবস্থানের পর তিনি একদিন সন্ন্যাসীবেশে অর্থাৎ ললাটে ভস্মরেখা, কণ্ঠে বড় বড় রুদ্রাক্ষমালা, গৈরিক বসন পরিধান ও হস্তে একটা লোটা লইয়া স্বামী বিরজানন্দের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দ্বারের কড়া খট খটাইলেন, তখন উপরের ঘর হইতে বিরজানন্দ বলিলেন, 'তুমি কে'? স্বামী উত্তর দিলেন, "এক সন্ন্যাসী"।

প্রঃ—তোমার নাম কি?

উঃ—দয়ানন্দ সরস্বতী।

প্রঃ—কিছু ব্যাকরণ পড়িয়াছ?

উঃ—সারস্বত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছি।

একথা শুনিয়া দণ্ডীজি দ্বার খুলিয়া দিলেন ও আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তৎপরে তিনি আমাকে আরও প্রশ্ন করিয়া আমার প্রমুখাৎ তদুত্তর শুনিয়া বলিলেন, ঋষিকৃত শাস্ত্র বা গ্রন্থ ও সাধারণ মনুষ্যকৃত গ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থই প্রমাণীয়। তৎপরে দণ্ডীমহারাজ আমাকে বলিলেন যে, সাধু সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিই না, কারণ সাধুসন্ন্যাসীগণ কোথা হইতে আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা করিবে? আমি তাহাতে উত্তর করিলাম যে যদি আমাকে শিক্ষা দেন, তবে আমি কোন মতে নিজ আহারাদির পৃথক ব্যবস্থা করিয়া লইব। তৎপরে তিনি বলিলেন, দেখ, তুমি যাহা এতকাল পড়িয়াছ ও শিখিয়াছ, তাহার মধ্যে প্রায় অধিকাংশই মনুষ্যরচিত গ্রন্থ। মনুষ্যরচিত গ্রন্থের প্রভাব ও সংস্কার তোমার মনে বিদ্যমান থাকিতে, আর্য্যগ্রন্থের মহিমা বা প্রভাব তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; এজন্য তোমায় সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যরচিত

অধীত বিষয় বিস্মৃত হইতে হইবে ও সর্ব্বাগ্রে তোমার নিকট যে সমস্ত মনুষ্যরচিত গ্রন্থ আছে, তৎসমুদায় যমুনার জলে ফেলিয়া দিয়া যতদূর সাধ্য তাহার সংস্কার পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া আমার নিকট আসিলে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার পাঠারম্ভ করাইতে পারি। আরও এক কথা, তুমি যেরূপ বলিয়াছ, তোমাকে আহার ও অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এস্থলে আর একটি বিষয় বর্ণন করা আবশ্যক। তাহা এই যে, আমি যে সময় মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হই, সে সময় যদিচ সিপাহীবিদ্রোহের সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়া ছিল বটে, পরন্তু তখনও সমগ্র ভারতে অশান্তি ও অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। সে সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ তাহার বিশাল করালবদন ব্যাদন করতঃ সহস্র সহস্র দীন দরিদ্রগণকে অনাহারে ক্লান্ত করিয়া মৃত্যুমুখে গ্রাস করিতেছিল। একারণে সে সময় আমার ন্যায় নিধন সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজ অন্নকষ্ট দূরীভূত করিয়া কিছুকাল একস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পাঠাদিতে মনোনিবেশ করা সহজ ব্যাপার ছিল না।—ঈশ্বরের অপার মহিমা—কোন ধর্ম্ম বিষয়ে তীব্র সংবেগ থাকিলে পরমাত্মা প্রায়ই তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এজন্য ভগবানের কৃপায় আমার মনোরথ পূর্ণ হয়—যাহা নিম্নলিখিত বিবরণে লিখিত হইতেছে। যদিচ আমার পুস্তকগুলিতে বড়ই মোহ ছিল, পরন্তু আমি নূতন বিদ্যালাভের জন্য গুরুর আজ্ঞানুযায়ী তাহা যমুনাসলিলে বাস্তবিকই নিক্ষেপ করতঃ যমুনায় স্নান করিয়া গুরু-সমীপে উপস্থিত হইয়া ছিলাম। আমি বিশ্রামঘাটের উপরিভাগে লক্ষ্মী-নারায়ণজিউর মন্দিরের নিম্নতলস্থ একটি প্রকোষ্ঠ নিজ বাসস্থান জন্য নিদ্ধারণ করিলাম। পাঠারম্ভ করিয়া দুই চারিদিন পর্য্যন্ত ছোলা ভিজান ও মটর ভাজা আদি খাইয়া দিন যাপন করি, পরন্তু শীঘ্রই পণ্ডিত অমরলাল ওরফে জ্যোৎসী বাবার বাটিতে আমার আহারেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই পণ্ডিতজী গুর্জ্জরদেশীয় উদীচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বহুকাল হইতে মথুরাতে বাস করিতেন। আমি নিজেও পূর্ব্বে ঔদীচ্চবংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ ছিলাম, এইজন্য জ্যোৎসী বাবা কিছু বিশেষ দয়া করিতেন ও আমার গুরুদেব আমার জন্য তাঁহাকে কিছু অনুরোধও করিয়াছিলেন। জ্যোৎসীবাবা আমার আহারাদির ব্যবস্থা ভিন্ন পাঠোপযোগী পুস্তকাদি খরিদ করিবারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইঁনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার আমার প্রতি এরূপ স্নেহ ও দয়া

ছিল যে, পূর্ব্বে আমাকে আহার করাইয়া পরে তিনি নিজে আহার করিতেন এবং কার্য্যার্থে কোথাও বাহিরে যাইতে হইলে আমাকে পূর্ব্বে আহার করাইয়া পরে তথায় গমন করিতেন। আমি সংবৎ ১৯১৯ বিক্রমাব্দ পর্য্যন্ত মথুরাতে অবস্থান করি। এখানে আর একটী বিষয় আমার কৃতজ্ঞতার সহিত বর্ণন করা আবশ্যক যে, শ্রীমান গোবর্দ্ধন সরাফ মহাশয় আমাকে রাত্রিতে পাঠের জন্য প্রদীপ জ্বালাইবার তৈল খরচ মাসিক ।০ চারি আনা দিতেন ও হরদেও দাস পাথরওয়ালা (প্রস্তরব্যবসায়ী) কৃপা করিয়া দুগ্ধ সেবনের জন্য মাসিক ২৲ টাকা করিয়া প্রদান করিতেন।

বিরজানন্দ স্বামী মহাশয় আমাকে উচ্চারণবিশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা দিলেন, তৎপরে তিনি পাণিনী অষ্টাধ্যায়ী ও পাণিনীর ব্যাখ্যাস্বরূপ মহাভাষ্য পাঠে প্রবৃত্ত করাইলেন। তৎপরে তিনি আমায় উপনিষৎ, মনুস্মৃতি, ব্রহ্মসূত্র, পতঞ্জলির যোগসূত্র প্রভৃতি ষড়দর্শন পাঠ করাইয়া ক্রমশঃ বেদ ও বেদাঙ্গাদি পাঠ করান।

বলা বাহুল্য আমি ভারতবর্ষে অনেক স্থানে অনেক পণ্ডিত ও তত্ত্বদর্শী দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মথুরাতে আসিয়া আমি গুরুজীকে হীনচক্ষু পাইলেও তিনি নিজ প্রজ্ঞাচক্ষু দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্বস্থান সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। ইহার নিদর্শন এই ছিল যে, আমি যখন যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতাম, তৎক্ষণাৎ তাহার এরূপ সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বতন্ত্রসম্পাদিত সুচারু প্রত্যুত্তর পাইতাম যে, তৎপরে আর আমার তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারিত না। অধিকন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিচ তিনি আজন্মকাল কোন গ্রন্থ বা কোন গ্রন্থের পত্র পরিদর্শন করেন নাই, অথচ তিনি তাঁহার অসাধারণ সর্ব্ববিষয়ক স্মৃতিশক্তির প্রভাবে, কি ব্যাকরণ কি সাহিত্য, কি সংহিতা, কি স্মৃতিশাস্ত্র কি বেদবেদাঙ্গ বা দর্শনাদির ব্যাখ্যা ও তাহার প্রকৃত-তত্ত্ব কথায় কথায় বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। আমি গুরুদেবের অসাধারণ বিদ্যা ও তর্কশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে "কুলক্কর" নামে অভিহিত করিয়াছিলাম, অর্থাৎ বিচারকালে আমার গুরুদেব খোঁটার মত অবিচলিত থাকিয়া বিরুদ্ধপক্ষের বাদকে পরাভূত করিতেন। *

* কথিত আছে, বিরজানন্দও দয়ানন্দকে অদ্ভুত বিচার ও ধীশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া তাঁহার নাম 'কালজিহ্ব" রাখিয়া ছিলেন, অর্থাৎ অসত্য বা ভ্রান্তি খণ্ডনে দয়ানন্দের জিহ্বা যে কালস্বরূপ ছিল, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

আমি যখন গুরুদেব-সমীপে শিক্ষা গ্রহণ করিতাম, তখন গুরুদেবের সেবার্থ ভৃত্যবৎ কোন কার্য্য করিতে ত্রুটী বা নিজকে সে কার্য্যের জন্য অপমানিত বিবেচনা করিতাম না। বিরজানন্দ স্বামীজির প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুষ্কল জলে স্নান করিবার অভ্যাস ছিল, এজন্য আমি প্রতিদিন তৎপূর্ব্বেই রাত্রি থাকিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক বড় বড় কলসী পূর্ণ করিয়া ১৫ হইতে ২০ ঘড়া জল আনিয়া একত্রিত করিতাম এবং এইরূপে সায়ংকালেও যথা সময়ে জল সংগ্রহ করিতাম। তাঁহার ও আমার পানীয় জলের জন্য যমুনায় সন্তরণ করিয়া কিয়দ্দূর হইতে পবিত্র জল আনয়ন করিতাম ও ইহা ছাড়া প্রতিদিন যথা সময়ে তাঁহার পদসেবা ও অঙ্গমার্জ্জনাদি কার্য্য ও নিদ্রার পূর্ব্বে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যজন করিতাম। পাঠে দত্তচিত্ত থাকিয়াও আমি প্রতিদিন যথাসময়ে যোগ-সাধন, সন্ধ্যাদি কার্য্য, ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ সহরের বাহিরে কয়েক ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিতাম।

গুরুজী আমাকে বেদ ও অন্যান্য বেদাঙ্গাদি আর্য্য-গ্রন্থ যথারীতি পাঠ করাইয়া সেই আর্য্য-গ্রন্থের নিদর্শন কি বা তাহার লক্ষণ কিরূপ, উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া শেষে পুরাণ ভাগবতাদি অনার্য্য গ্রন্থের দোষ ও খণ্ডনাদি বিষয় শিক্ষা প্রদান করেন। * যখন আমার গুরুর নিকট বিদ্যাধ্যয়ন সমাপ্ত হইল, তখন আমি গুরুদেবকে কি গুরুদক্ষিণা দিব ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না, পরে মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, আমি ত পূর্ব্ব হইতেই নিজ শরীর ও আত্মা তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে অর্পণ করিয়াছি, এখন আর আমাতে কি বাকি আছে—যাহা আমি তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারি? তথাপি বাহ্যরীতিরক্ষার্থে একটী থালায় কিছু লবঙ্গ লইয়া তাঁহার সম্মুখে গুরু-দক্ষিণা স্বরূপে অর্পণ করিলাম ও বলিলাম, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী, অর্থাদি আমার

---

* কথিত আছে, বিরজানন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বদা বলিতেন যে, আমি দয়ানন্দরূপী যে অগ্নি ধূমাকারে তোমাদের নিকট বিনিবিষ্ট করিয়া দিতেছি, কালে এই ধূম-নিঃসৃত অগ্নি দাবানলরূপী মহাগ্নিতে পরিণত হইয়া ভারতভূমির অসংখ্য ভ্রান্তমত-মতান্তররূপী-জঙ্গলকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে এবং এই দয়ানন্দ দ্বারা ভারতে পুনঃ বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপিত হইবে। ফলতঃ তাঁহার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য স্বরূপ ঘটিয়াছিল।

নাই, আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধাদিই গুরুদক্ষিণা স্বরূপে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক। বিরজানন্দ বলিলেন, দয়ানন্দ! আমি তোমার গুরুভক্তি, পাঠ ও চরিত্রে অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি। তোমার নিকট আমি অন্য কোনরূপ গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিব না। আমি তোমাকে মন খুলিয়া যথার্থ আমার যাহা কিছু অমূল্য ধন ছিল, তদ্‌সমুদায়ই তোমায় প্রদান করিয়াছি। আমি কোনরূপ অর্থের বিনিময়ে তোমাকে বিদ্যাদান করি নাই। পাছে আমার উপার্জ্জিত বিদ্যা জগত হইতে বিলুপ্ত হয়, এজন্য তোমাকে তাহা জীবিত রাখিবার জন্য প্রদান করিয়াছি। তুমি সত্য শাস্ত্রের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইবে, অনার্য্য গ্রন্থ ও মিথ্যা মত—মতান্তরের খণ্ডন করিবে ও ভারতে পুনঃ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী থাকিবে, ইহাই আমার প্রকৃত গুরু দক্ষিণা। * আমি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম এবং তাঁহার কথা ও উপদেশ স্মরণ রাখিয়া তাঁহার আদেশ ও উপদেশ পালন করি। তাঁহার উপকারিতা কখন বিস্মৃত হইয়া অকৃতজ্ঞ না হই, তজ্জন্য তিনি আমার শরীরে একটী চিরস্থায়ী (অন্ততঃ যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন) এক পবিত্র চিহ্ন আমাকে কৃপাপূর্ব্বক অর্পণ করিয়াছিলেন। বলিতে কি দয়ানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বলিতেন বলিয়াই তাঁহাকে বাহ্য তাড়না পর্য্যন্ত করিতেন—যাহাতে তিনি কদাপি কোন রূপে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত না হন। একদিন দণ্ডী স্বামী দয়ানন্দকে অত্যন্ত তাড়না ও কটুবাক্য বলায় তাঁহার নয়নসুখ নামক একটী সহপাঠী গুরুজীকে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন যে, দয়ানন্দ একজন সন্ন্যাসী ও তাহার বয়স হইয়াছে, আবার তাহাতে সে ভদ্র সন্তান, এজন্য তাহার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার আপনার শোভা পায় না। তাহাতে দণ্ডী স্বামী হাসিয়া বলিলেন যে, ভাল, আজ হইতে আমি তোমার দয়ানন্দের প্রতি আদর ও প্রতিষ্ঠার সহিত ব্যবহার করিব। একথা শুনিয়া দয়ানন্দের মনে বিশেষ ক্ষোভ হয় এবং বাহিরে আসিয়া, সহপাঠীকে বলেন নয়নসুখ ভাই,

---

* বলিতে কি স্বামীজী তাঁহার জীবনে গুরু আজ্ঞা তন্ন তন্ন করিয়া পালন করেন ও শেষে এই বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থে নিজ জীবন পর্য্যন্ত বলি দিতে ত্রুটি করেন নাই।

তুমি বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, গুরুজীকে তোমার এরূপ বলা ভাল হয় নাই। তুমি জাননা যে, গুরুদেব কেন আমার প্রতি এরূপ বাহ্য তাড়না করেন! তাঁহার আমার প্রতি পুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ ও ভালবাসা আছে। তিনি নিজ ক্রোধ শান্তির জন্য নহে, পরন্তু কেবল আমার হিতার্থেই আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন। বলিতে কি, যেরূপ কুম্ভকার মৃত্তিকাকে পিটিয়া পিটিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া তদ্দ্বারা বিবিধ প্রকার বাসন ও মূর্ত্তি আদি গঠন করে, তদ্রূপ গুরুদেব আমার ন্যায় মৃত্তিকাবৎ নগণ্যকেও পিটিয়া পিটিয়া কার্য্যোপযোগী করিতেন। তুমি আর কৃপাপূর্ব্বক এরূপ বলিও না, তাহা হইলে আর তিনি আমাকে তাড়না করিবেন না; তাহা হইলেই আমি অপূর্ণ থাকিয়া যাইব। গ্রন্থকার বিদ্যাপাঠ সাঙ্গ করিবার কিছু পূর্ব্বে আর একটী ঘটনা ঘটে। বিরজানন্দের আদেশ ছিল যে, তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার ছাত্র ভিন্ন অপর কোন বাহিরের লোক যেন তাঁহার নিকট না যায়। একদিন একজন বিরাজানন্দের পরম আত্মীয় আমাকে অনেক মিনতি করায় আমি তাঁহাকে লইয়া গুরুদেবের আশ্রমে যাই এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ করাইয়া তৎসহ চলিয়া আসি; একথা গুরুদেব পরে জানিতে পারেন, এই সামান্য আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য গুরুদেব পর দিবস ক্রোধপরবশ হইয়া আমাকে নিজ সমীপ হইতে তাড়াইয়া দেন ও কিছুদিন আর সমীপে আসিতে দেন নাই। আমি পথের ভিখারীর ন্যায় গুরুদেবের সমস্ত পরিচিত লোকের কাছে গিয়া যাহাতে গুরুদেবের সহিত পুনর্মিলন ঘটে, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, শেষে পরম মিত্র নয়নসুখ গুরুজীকে অনেক অনুনয়বিনয় করায় গুরুদেব পুনরায় আমাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন, তখন আমি অন্য আর কোন দিকে মন না দিয়া একবারে কায়মনোবাক্যে পাঠ সমাপন করিবার চেষ্টায় রহিলাম।

আমার মনে, কোনরূপ মন্দ সংস্কার প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য আমি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতাম এবং নিজ মনকে সদা বিশুদ্ধভাবে স্থিত রাখিতাম। বলিতে কি দয়ানন্দ অখণ্ডব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আদিত্যব্রহ্মচারীর নামের সার্থকতা প্রদর্শন করাইতে সমর্থ হন। লোকে তাঁহার বিশাল তেজোময় দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই যেন বুঝিতে পারিত যে, ইনি একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও মহাপুরুষ, ইঁহার মনে ও আত্মায় লেশমাত্রও কুসংস্কার

স্থান পায় নাই। কথিত আছে যে, একদিন দয়ানন্দ যমুনাপুলিনে স্নানাদি সমাপন করিয়া যমুনার ঘাটেই ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এমন সময় একটী শ্রদ্ধা-বতী তীর্থযাত্রিণী তীর্থ দর্শনে আসিয়া তাঁহাকে তীর্থের জীবন্ত দেবতা দর্শনে পরম ভক্তিসহকারে সেই ধ্যানাবস্থিত অবস্থাতেই তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করেন। এই স্ত্রীলোকের শীতল বস্ত্রের স্পর্শে স্বামিজীর ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল ও তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—এক নারী করযোড়ে অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ "মাতা মাতা" বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন ও উক্ত নারীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তথা হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট এক ভগ্ন মন্দিরে তিন দিবস অনাহারে থাকিয়া প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন ও ধ্যানস্থ থাকেন। যখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মন হইতে আর স্ত্রীজাতির স্পর্শ জন্য সংস্কার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া গুরু সমীপে আসিয়া পাঠারম্ভ করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে কয়েকদিবস অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় দয়ানন্দ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। তাহাতে বিরজানন্দ তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন হইতে আর দয়ানন্দ ভবিষ্যতে কখন যমুনার ঘাটে স্নানাদির পর সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন না বা ধ্যানমগ্ন থাকিতেন না।

দণ্ডী স্বামী মধ্যে মধ্যে ক্রোধপরবশ হইয়া তাঁহাকে যষ্টিপ্রহার পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটী করিতেন না। কথিত আছে, বিরজানন্দ একবার অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া দয়ানন্দকে চড় চাপড় লাথি ঘুসি মারিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া যষ্টি দ্বারা প্রহার করেন। তখন স্বামী দয়ানন্দ অত্যন্ত বিনীতভাবে করযোড়ে প্রার্থনা করেন যে, দেব! আমার শরীর অত্যন্ত কঠিন এবং আপনি জীর্ণ; কি জানি ক্রোধপরবশ হইয়া হস্ত দ্বারা আমাকে প্রহার করিলে আপনার হস্তে বা শ্রীপাদে বেদনানুভব হইতে পারে, এজন্য আমাকে তাড়নার সময় এইরূপ যষ্টি দ্বারাই প্রহার করিবেন। এই কথা তিনি সরল অন্তঃকরণে বলিয়াছেন। আহা! কি গুরুভক্তি! ইহাকেই বলে মহানুভবতা। আর একবার দণ্ডী স্বামী এরূপ সজোরে যষ্টি (সোটা) দ্বারা দয়ানন্দের হস্তে প্রহার করেন যে, সেই প্রহার-চিহ্ন তাঁহার হস্তে আজীবন

ছিল এবং সেই প্রহার-চিহ্নকে দয়ানন্দ সরল অন্তঃকরণের সহিত (অর্থাৎ লোক দেখান নহে) নিজ শরীরস্থিত পবিত্র চিহ্ন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কখন কখন তাঁহার চক্ষে জল আসিত, অমনি বলিতেন, গুরুদেব আমার হিতার্থে ও তাঁহাকে যাহাতে আমি আজীবন বিস্মৃত না হই, তজ্জন্যই তিনি আমার গাত্রে এই স্মারকচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

ইতি দয়ানন্দের বিদ্যাশিক্ষারূপ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় খণ্ড। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সম্বৎ ১৯২০ বিক্রমাব্দের শেষ ভাগে অর্থাৎ সন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ-সরস্বতী নিজ গুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সত্য বৈদিকধর্ম্ম-প্রচার ও মিথ্যা প্রচলিত উপধর্ম্ম সকলের খণ্ডনার্থ দিগ্‌বিজয়ার্থ মথুরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আগরা মহানগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় যমুনানদী-তীরে ভৈরবমন্দিরের সন্নিকট লালা গন্নামল রূপচন্দ মহাশয়ের উদ্যান-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি প্রায় দুইবৎসর কাল অবস্থিতি করেন ও সর্ব্বদাই স্বাধ্যায় ও যোগাভ্যাসে দিন যাপন করিতেন। এখানে প্রকাশ্য ভাবে কোন বিষয়ে বক্তৃতাদি দিতেন না, তবে শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ও লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায়,ভাগবতাদি পুরাণের অসারতা প্রদর্শন করাইতেন। যদি স্বাধ্যায় কালে অথবা অন্য বিষয়ে, তাঁহার মনে কোনরূপ শঙ্কা উপস্থিত হইত, তবে তিনি স্বয়ং মথুরায় গিয়া অথবা গুরুদেবের সমীপে পত্রদ্বারা প্রশ্ন লিখিয়া তদ্বিষয়ক শঙ্কা সমাধান করিতেন। আগরা মহানগরীতে পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতি কয়েক জনের সহিত স্বামীজির বিশেষ প্রেম ও বন্ধুত্ব জন্মে ও এই বন্ধুত্ব আজীবন অবিচ্ছিন্ন ছিল। এখানে স্বামিজী মধ্যে মধ্যে যমুনাতীরে যাইয়া হঠযোগ-সম্বন্ধীয় নাড়ী ধৌত ও বস্তি ক্রিয়াদি করিতেন। কথিত আছে, এই স্থানে তাঁহার সমগ্র শরীরে ফোড়া বাহির হয়, তজ্জন্য এক দিবস কতিপয় বন্ধু ও ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীর-রাজঘাটে উপস্থিত হন ও তথায় বস্তিক্রিয়া দ্বারা নাভিচক্র ঘুরাইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া জল উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া পাকস্থলীর নিম্নস্থ অন্ত্র সকলকে ধৌতপূর্ব্বক পুনঃ অপান-বায়ুর সহায়তায় তাহা বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই ক্রিয়া তিনি সেই দিবস ৩।৪ বার করিয়া বাটী আসিয়া অতি অল্প পরিমাণ ডাল-ভাত আহার করেন এবং এইরূপ করার পর অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার সমস্ত

* দ্বিতীয় খণ্ড হইতে আমরা স্বামীজি-সম্বন্ধে উত্তম পুরুষ ব্যবহার না করিয়া প্রথমপুরুষ ব্যবহার করিবে। গ্রন্থকার

স্ফোটকগুলি দুরীভূত হইয়া যায় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হন। এই সময় স্বামীজি প্রায়ই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সমাধিস্থ থাকিতেন। এক সময় তাঁহার এক ভক্ত তাঁহাকে ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমাধিস্থ থাকিতে দেখিয়া ছিলেন। এইস্থানে স্বামীজি শ্রীমান্ রূপলালজী মহাশয়ের সহায়তায় সংক্ষিপ্ত সন্ধ্যাবিধি প্রণয়ন ও মুদ্রিত করেন। কথিত আছে যে ন্যূনাধিক তাহার ৩০ হাজার কাপি বিনামূল্যে বিতরিত হয়। স্বামিজী আগরায় প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধেও উপদেশ দেন এবং এই স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চেতুলাল ও কালীদাস স্বামীজির সহিত শাস্ত্র-তর্কে পরাস্ত হইয়া উভয়েই তাঁহার সহমত হন ; কিন্তু গৃহস্থ বিধায় জীবিকা নষ্টের ভয়ে এবং স্বতন্ত্র উপজীবিকা না থাকায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা যজমানের পূজাপাঠাদি করাইতেন। পরন্তু পণ্ডিত সুন্দরলাল ও আর একজন মথুরাবাসী পণ্ডিত ঘাসীরাম, ইহাঁরা সর্ব্বসমক্ষে শিবলিঙ্গ পূজন ও মূর্ত্তিপূজা ঘৃণিত বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এখানে একজন মূর্খ ব্রাহ্মণ স্বামিজীর নিকট আইসে, যদিচ তাহার কোনরূপ লেখাপড়া জানা ছিল না, পরন্তু সে হঠযোগের ৬৪ প্রকার আসন রীতি জানিত। সে স্বামীজির নিকট আসিয়া কোনপ্রকার জীবিকা প্রার্থনা করায় তিনি তাহাকে বস্ত্রাদি ধৌত ও সময় সময় রন্ধনাদিতে নিযুক্ত করিতেন। এই ব্রাহ্মণ সন্তোষী, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারী ছিল।

স্বামিজী আগরায় প্রায় দুইবৎসর অবস্থান করিয়া, সন ১৮৯৬ সালের শেষ-ভাগে তথা হইতে ঢোলপুরে যাত্রা করেন ও তথায় আন্দাজ ১৫ দিবস অবস্থান করিয়া সমাগত লোকসকলকে সত্য বৈদিকধর্ম্মের উপদেশ দিতেন। প্রকৃত যোগী-গণের সহিত সৎসঙ্গ করিবার বাসনায় স্বামীজি এস্থান হইতে আবুপর্ব্বতশিখরে যাত্রা করেন এবং সেখানে অল্পদিবস অবস্থান করিয়া পরে গোওয়ালির (লস্কর) নামক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া—শ্রীরামকুইবাপু অপাতনাবেল বাহাদুরের গঙ্গামন্দিরে অবস্থান করেন। তৎকালে তথাকার রাজা শ্রীমান্ মহারাজ জওয়াজি রাও সিন্ধিয়া রাজ-গদীতে আসীন ছিলেন। এই সিন্ধিয়া-মহারাজ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের দীর্ঘজীবন লাভ কামনায়, কাশী, সুরট ও আহমেদাবাদদি অনেক স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভাগবত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তথায় একত্রিত করেন। স্বামিজী হঠাৎ সে সময় তথায় উপস্থিত হন। ইঁহার যশ ও বিদ্বত্তা বিষয় ইতিপূর্ব্বেই চারিদিকে ঘোষিত হইয়াছিল, একারণ, মহারাজ তাঁহার রাজপণ্ডিত

দ্বারা ভাগবত পাঠ ও ভাগবত কথার মাহাত্ম্য বিষয় স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং তাঁহাকেও ঐ ভাগবত পাঠ সময়ে উপস্থিত থাকিতে প্রার্থনা করেন। স্বামিজী সত্যবাদী সত্যকারী ও সত্যমানী বিধায়, মহারাজের নিকট তাঁহার যথার্থ হিতার্থে অপ্রিয় সত্য বিষয় বলিতে বা প্রকাশ করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি সিন্ধিয়া-মহারাজকে স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইলেন যে ভাগবত অনার্ষ গ্রন্থ, ইহা ব্যাসদেবপ্রণীত নহে, ইহা বোপদেবকৃত পুস্তক, এজন্য ইহার শাস্ত্রীয় পাঠ বিহিত নহে এবং অবৈধ ও অবিহিত বিধায় পাপজনক ও তজ্জন্য দুঃখ-দায়ক। তিনি আরও উপদেশ দিলেন, যদি বাস্তবিক শান্তি বা স্বস্তি করাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে বেদের শান্তি-স্বস্তয়ন পাঠ, হোম এবং গায়ত্রী ও প্রণবের পুরশ্চরণ করান কর্ত্তব্য। ইহাপেক্ষা আর শুভদায়ক ও শান্তিকারক কার্য্য নাই। স্বামীজির এই কথার উত্তরে মহারাজ বলিলেন, আমি গৃহস্থ, স্বামিজী সন্ন্যাসী ও নিজে সামর্থ্যবান্ মহাপুরুষ, এজন্য তাঁহার পক্ষে এ সমস্ত কথা সাজে। তিনি আরও বলেন যে, ভাগবত-পাঠ-প্রবন্ধ-বিষয় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে,এখন আর তদ্বিষয় হইতে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব ; এজন্য স্বামীজির অমতেও ভাগবত পাঠকার্য্য যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তিথিতে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। পরন্তু দৈবী লীলা বিচিত্র। কারণ দৈববশতঃই হউক অথবা স্বামীজি আপ্তপুরুষ ও যোগী বিধায়, তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া ছিলেন যে, এই কার্য্যের পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইবে, এজন্য তিনি মহারাজকে এই কার্য্যে ব্রতী না হইতে অনুরোধ করেন। যাহা হউক, যে দিবস ঐ সকল সমাগত মহাপণ্ডিতগণ মধ্যে শ্রীগোবিন্দ বাবার পাঠ সমাপ্ত হয়, সেই দিবস রাত্রিতেই পট্ট-মহিষীর পঞ্চম মাসের গর্ভ হঠাৎ পাত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত করিয়া ছিল। যদিচ তিনি কোনরূপে জীবনরক্ষা পাইলেন বটে, পরন্তু তাহার পরে সমগ্র দেশমধ্যে অতি ভয়ানক সংক্রামক বিসূচিকা রোগ প্রকাশিত হইল, যাহাতে অনেক প্রজা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল এবং সর্ব্বাপেক্ষা আরও শোকের কারণ এই ঘটিল যে, যে রাজপুত্রের দীর্ঘজীবনের কামনায় এই ভাগবত পাঠ করান হয়, তাহার সমাপ্তির পর, পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদাদি দান করিবার কিছুদিন পরেই সেই রাজপুত্রও হঠাৎ বিসূচিকা রোগাক্রান্ত

হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই দুর্ঘটনায় সমগ্র রাজ্য মধ্যেই হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, মহাত্মা যোগী দেবপ্রতিম স্বামীজির কথা না শুনায়, এই সমস্ত অনর্থ ঘটিল। কথিত আছে, এই সময়ে ভাগবতপাঠী সমাগত পণ্ডিতবর্গকে স্বামিজী সত্যধর্ম্ম নির্ণয়ার্থ আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহারা আর দেবকল্প দয়ানন্দের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। গোয়ালিয়র (লস্কার) সহরে স্বামীজি প্রকাশ্যভাবে বৈষ্ণব মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মমত খণ্ডনকালে একবার বলিয়াছিলেন "যদি ললাটে কৃষ্ণবর্ণ রেখা ধারণ করিলে মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়, তবে সমগ্র মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ-রেখাঙ্কিত করিলে মোক্ষ অপেক্ষাও অধিকতর সুখপ্রদ স্থান পাওয়া উচিত"।

স্বামীজির অসাধারণ সত্যবাদিতা ও নিজদোষ বা ত্রুটী-স্বীকরণ অসামান্য ছিল। তিনি যে একজন অসাধারণ বৈয়াকরণ ছিলেন, একথা তাঁহার শত্রুগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। পরন্তু তখন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে কখন কখন কোন কোন শব্দ হঠাৎ অশুদ্ধ বাহির হইয়া যাইত। তাহা তিনি নিজ জীবনীতে নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কৃত নিজ জীবনীতে প্রকাশ করেন যে, গোয়ালিয়রে অবস্থান কালে এক ব্যক্তি সাধারণ ক্লার্ক বা বা লেখক বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকট বসিয়া শাস্ত্রালোচনা বা খণ্ডনাদি শুনিতেন। শাস্ত্রার্থ করিবার সময় দৈবাৎ তাঁহার মুখ দিয়া কোন অশুদ্ধ শব্দ বাহির হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। স্বামীজি পরে তাঁহার বিষয় সন্ধান করিয়া জ্ঞাত হন যে, উক্ত ব্যক্তিটী ক্লার্ক নহেন, গোয়ালিয়র সহরে পণ্ডিত অনুমতাচার্য্য নামক যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন—ইনিই তিনি। যাহা হউক, যদিচ তিনি স্বামিজীর সংস্কৃত কথার মধ্যে দুই একটী অশুদ্ধি সংশোধন করিতেন বটে, পরন্তু তদ্বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে শাস্ত্রার্থ করিতে সাহসী হন নাই। গোয়ালিয়রে বৈষ্ণব মত খণ্ডন করিয়া স্বামীজী করোলী রাজধানীতে গমন করেন। তথায় বিশেষ কোন শাস্ত্রার্থ হয় নাই, তবে তথায় এক প্রবীণ কবির-পন্থীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। তিনি কবির শব্দের বুৎপত্তি—"ক" শব্দে ব্রহ্মা, "বি" শব্দে বিষ্ণু ও "র" শব্দে রুদ্র বা মহাদেব অর্থাৎ একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ত্রিদেবের অবস্থিতি বর্ণন করেন ও আরও বলেন যে, কবির শব্দে এক বীর এরূপও বুঝায়, এই লোকটী স্বামীজির সম্মুখে

কবিরোপনিষদ্ নামক এক নবীন উপনিষৎ দেখান। অবশ্য স্বামীজি তাঁহাকে কবির সাহেবের উপাসনা পদ্ধতির ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারই বুঝাইয়া দেন।

করোলি রাজধানী হইতে স্বামিজী জয়পুরে যাত্রা করেন ও তথায় রাজকুমার ও নন্দরাম মোদী মহাশয়দ্বয়ের উদ্যান ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক লোক আসিয়া তাঁহার নিকট নবীন-বেদান্ত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একতা বিষয় এবং বৈষ্ণব মত বিষয়ের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া যাইত। জয়পুরে হরীশচন্দ্র নামক একজন বিখ্যাত বৈষ্ণবমতাবলম্বী পণ্ডিত থাকিতেন। তথাকার মহারাজও বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। এই হরীশচন্দ্রকে স্বামীজি শাস্ত্রার্থে পরাস্ত করিয়া শৈবমতের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। সেই সময় মহারাজা জয়পুরাধীশ শ্রীমান্ রামসিংহজী বৈষ্ণব ও শৈবমতের মধ্যে কোন্ মত শ্রেষ্ঠ, তাহার নির্দ্ধারণার্থ যোধপুর আদি স্থান হইতে বহুজ্ঞপণ্ডিতগণকে আনাইয়া মীমাংসা করাইতে চাহিয়া ছিলেন। রামসিংহ মনে মনে শৈবমতের পক্ষাবলম্বী ছিলেন; এজন্য রাজা মহাশয়ের এক প্রিয় পণ্ডিত ব্যাস বক্‌শীরামজী রাজাজ্ঞানুসারে দয়ানন্দ সরস্বতীকে রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে আহ্বান করাইয়া শাস্ত্রার্থ করান। তাহাতে ঐ বৈষ্ণবমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ পরাস্ত হন। পরন্তু ব্যাসজী দেখিলেন যে, স্বামী দয়ানন্দ রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন নাই, এজন্য তিনি বুঝিলেন যে, ইনি মূর্ত্তিপূজামাত্রেরই বিরোধী। একারণ শাস্ত্রার্থে জয়লাভ ও তাঁহার পক্ষ সমর্থন হওয়া সত্ত্বেও, রাজাসাহেবের মনে সন্দেহ উপস্থিত করাইয়া মহারাজের সহিত স্বামিজীকে সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই। রাজা মহাশয় এই শাস্ত্রার্থের পর হইতেই বৈষ্ণবমত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে শৈবমত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এসময় রুদ্রাক্ষের এরূপ ব্যবহার প্রচলিত হয় যে, রাজদরবারের ঘোটক ও হাতীর গলাতেও রুদ্রাক্ষমালা দোদুল্যমান থাকিত। *

* স্বামীজির এই শৈবমতপ্রাধান্যের প্রচার দ্বারা বুঝা যায় যে, তখনও তাঁহার মন হইতে শৈশবকালের শৈবসংস্কার একবারে বিদূরীত হয় নাই; কিন্তু অল্পদিন পরেই আজমীরে গিয়া তিনি তাহারও খণ্ডন করিয়াছিলেন। অবশ্য এই শাস্ত্রার্থে বৈষ্ণব হইতে শৈবমত যে অপেক্ষাকৃত উত্তম, ইহাই স্বামীজী প্রতিপাদন করেন। পরন্তু পাছে লোক মনে করে স্বামীজি শৈবমত সত্য বলিয়া মানিতেন, একারণ তিনি আজমীরে প্রকাশ্যভাবে তাহার খণ্ডন করিয়াছিলেন।

কথিত আছে জয়পুরে একজন যতি স্বামীজির সহিত শাস্ত্রার্থ করিতে চাহেন, প্রথমে সামান্য প্রশ্নোত্তরের পরেই তিনি পশ্চাদপাদ হন ও তজ্জন্য সম্যক্ শাস্ত্রার্থ হয় নাই।

অচরোলের বিখ্যাত সর্দার ঠাকুর রণজীৎ সিংহ, স্বামীজির যশঃ শুনিয়া তাঁহার সহিত জয়পুরে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই ঠাকুর বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন; পরন্তু অতি সত্বরই স্বামীজির সহবাসে নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি কিছুদিন জয়পুরে থাকিয়া স্বামীজিকে অচরোলে শুভাগমন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজি তাহাতে স্বীকৃত হন। তজ্জন্য এই ঠাকুর অচরোল পৌছিয়া স্বামীজির জন্য যান প্রেরণ করেন। পরন্তু স্বামীজি যান পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পদব্রজে তথায় গিয়া উপস্থিত হন এবং প্রায় চারিমাস কাল সেখানে অবস্থান করেন। কথিত আছে, এই ঠাকুরজীর সহিত তথাকার অনেকে মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া মূর্ত্ত্যাদিকে জলে ভাসাইয়া দেন। এস্থানে স্বামীজি এক পর্ণকুটীরে বাস করিতেন এবং সমাগত সৎসঙ্গীদিগকে মনুসংহিতা ও গীতা শাস্ত্রের উপদেশ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকারিতার বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। এইস্থানে রণজিতের কায়স্থ কর্ম্মচারী হরিলাল, স্বামীজির উপদেশ শুনিয়া, মদ্যপান ও অপরাপর পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যাহা দেখিয়া তৎসঙ্গে আরও কয়েক জন মদ্যমাংসাদি পান ও ভোজন বর্জ্জন করেন। কথিত আছে যে, স্বামীজী এই অচরোলে স্থিতিকালে ভাগবত-খণ্ডন-বিষয়ক এক পৃষ্ঠা কাগজ মুদ্রিত করিয়া ও তত্ত্ববোধ নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়া ঠাকুর সাহেবকে উপহার দেন। কিছুদিনের পর চৈত্রমাসে স্বামীজি ঠাকুরসাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পরে বগরুর ঠাকুর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তথায় দুই দিবস অবস্থান করতঃ দুদুরের ঠাকুর সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা জন্য তথায় গমন করেন। সেখানে দুইদিন অবস্থান করিয়া বৈদিকধর্ম্মের গভীর তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ দেন। দুদুরের ঠাকুর সাহেব স্বামীজির পূর্ণ মতাবলম্বী হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এস্থান হইতে স্বামীজি কৃষ্ণগড়ের ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় দুই-দিবস অবস্থান ও বৈদিকধর্ম্ম প্রচার করিয়া সংবৎ ১৯২৩ বিক্রমাব্দের কৃষ্ণপক্ষীয় চৈত্রে অর্থাৎ সন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে পুষ্কর-রাজ-তীর্থে উপস্থিত

হইলেন এবং তথাকার ব্রহ্মার বিশাল মন্দিরে বাসা স্থির করিলেন। এই ব্রহ্মা-মন্দির মানপুরী নামক মহান্তের অধিকারে ছিল। এখানে থাকিয়া স্বামীজি মূর্ত্তি-পূজার বিপক্ষে বিশেষ বিশেষ স্থানে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মার মন্দির মধ্যেই ব্রহ্ম-মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধেও বক্তৃতা দেন। যদিচ মন্দির মধ্যে সেইরূপ বক্তৃতা, মহান্তের প্রীতিকর হয় নাই, তথাপি তিনি কখন দয়ানন্দের বিরোধী হইতে সাহসী হন নাই। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিতেন। একদিবস পুষ্করের স্বার্থী পণ্ডিতগণ গুটীকত দুষ্ট গুণ্ডাসহ একত্রিত হইয়া স্বামীজির সহিত শাস্ত্রার্থে অগ্রসর হন, পরন্তু স্বামীজী প্রদত্ত যুক্তিতর্ক ও প্রমাণাদি শুনিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে আর কেহ তাঁহার শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। তখন তাঁহারা গুণ্ডাদিগকে উত্তেজিত করিলেন, গুণ্ডাগণ স্বামীজিকে কুবাক্য বলিতে লাগিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ বা মারিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়াছিল। স্বামীজির নির্ভীকচিত্ত; তিনি অটল ও অচল স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন ও মনে মনে ভাবিলেন যে,"যদি আমি একবার হুঙ্কার প্রদান করি,তাহা হইলে ইহারা তাহা শুনিয়াই পলাইয়া যাইবে"। যাহা হউক, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই পুরী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তথাকার পণ্ডিত ও গুণ্ডাগণকে যার পর নাই ভর্ৎসনা করিলেন। এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। তখন স্বামীজি তথায় দাঁড়াইয়া নির্ভীকচিত্তে সমাগত লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ এইরূপে পরাস্ত হইয়া সকলে মিলিয়া তথাকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিদ্বান পণ্ডিতবঙ্কট শাস্ত্রী—যিনি নাগপর্ব্বতের এক কন্দরে বাস করিতেন ও যিনি ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রে কাশীর প্রসিদ্ধ বালশাস্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না—তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পণ্ডিতদিগের প্রার্থনায় এই বংকটশাস্ত্রী মহাশয় স্বামী দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্রার্থ করিতে সম্মত হন। এই শাস্ত্রী মহাশয়ের এক অঘোরী গুরু ছিলেন, তিনিও অতি প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। যাহা হউক, এই শাস্ত্রী মহাশয় যথাসময়ে পুষ্করে আসিয়া স্বামীজির সহিত শাস্ত্রার্থ না করায়, স্বামীজি স্বয়ংই ২।৩শত পণ্ডিত সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। সর্ব্বাগ্রে পরস্পর ব্যাকরণের শব্দ লইয়াই বিচার হয়। পরে তাহাতে শাস্ত্রীমহাশয় পরাজিত

হইয়া ভাগবত বিষয়ের খণ্ডনে পক্ষ লইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারও সমর্থন করিতে পারিলেন না, তখন চণ্ডী-গ্রন্থের উপর শাস্ত্রার্থ হইল। উভয় পক্ষেরই অতি স্পষ্ট সুললিত ও শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা উচ্চারিত হইয়া ছিল। পরিশেষে শাস্ত্রী-মহাশয় সমাগত পণ্ডিতগণকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, স্বামীজীর পক্ষ সত্য, এজন্য দৃঢ় ও তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্রমতে সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করি। পরে তিনি নিজ গুরুদেব অঘোরীবাবার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়াদিলেন, তিনিও স্বামীজীকে বলেন, তোমার পক্ষ সত্য। তৎপরে শাস্ত্রীজি এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া ছিলেন, যদি তোমার সহিত কোন পণ্ডিত বিচার বা বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে সংবাদ দিলেই আমি নিজে ও আবশ্যক হইলে গুরু-দেবকেও লইয়া আপনার পক্ষ সমর্থন করিব। স্বামীজী তৎপরে রামানুজ-সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণকে প্রকাশ্য শাস্ত্রার্থে বা বন্ধুভাবে উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ আহ্বান করেন এবং তদ্বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে বক্তৃতাদি দেন—যাহার ফলে অনেকে কণ্ঠমালা পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাদি করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী এই পুষ্করতীর্থেই "তপ্ততনুঃ স্বর্গং গচ্ছতি" ইত্যাদি বিষয়ে যাহা রামানুজাচার্য্যের প্রধান মত, ইহার বাস্তবিক প্রকৃতার্থ কি, তাহা বুঝাইয়া দেন। তিনি বলিয়াছিলেন ইহার প্রকৃতার্থ এইরূপ যে, জ্ঞানাগ্নিজনিত দগ্ধীভূত শরীরও তৎসহ মন মুক্তির অধিকারী এবং যে জন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাধ্যায় আদি সাধন বা তপস্যাদ্বারা নিজশরীরকে তপ্ত বা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি স্বর্গ বা মুক্তি প্রাপ্ত হন, নচেৎ ষাঁড়ের ন্যায় শরীরে তপ্ত লৌহ দাগ করিয়া দিলে মুক্তি হয় না। স্বামীজী তথাকার কয়েকজন পূজারী ও পাণ্ডাগণকে বুঝাইয়া নিজমতে আনিতে সমর্থ হন। ইঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত শিবলাল নামক একজন পূজারী বৈদিকধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিজ পূর্ব্ব পেসা পরিত্যাগ করিয়া ডাকঘরে চাকুরী স্বীকার করেন।

তৎপরে স্বামীজী সংবৎ ১৯২৩ বিক্রমাব্দে কৃষ্ণপক্ষীয় জ্যৈষ্ঠমাসে (বিতারিখ ২০শে মে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) পুষ্কর হইতে আজমীর মহানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন ও তথায় বংশীলাল সেরেস্তাদার মহাশয়ের উদ্যান-বাটীতে নিবাস করেন। এখানকার আতিথ্য সৎকারের ভার শ্রীমান্ শেঠ কৃষ্ণচন্দ্রজী লইয়া ছিলেন। স্বামীজী আজমীরে আসিয়া মূর্ত্তিপূজা অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় এই বিষয়ে শাস্ত্রার্থের

জন্য সহরের মধ্যে ও উপনগরে বিবিধ স্থানে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেন ও পথে ঘাটে টাঙ্গাইয়া অথবা দেওয়াল আদি স্থানে আটা দিয়া লাগাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বেই স্বামীজীর বিদ্বাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছিলেন, এজন্য স্থানীয় কোন পণ্ডিত আর শাস্ত্রার্থে অগ্রসর হন নাই। তবে গুটিকত ধূর্ত্ত লোক স্বামীজীর নিকট দুইটী প্রশ্ন শঙ্কাস্বরূপে লিখিয়া পাঠান, যথা ১ম প্রশ্ন—শাস্ত্রানুযায়ী চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন স্থানে একাদিক্রমে তিন দিবসের অধিক অবস্থান করা নিষিদ্ধ,২য় প্রশ্ন—সন্ন্যাসীর পক্ষে শকটারোহণের বিধি নাই। অতএব কি জন্য স্বামীজী সন্ন্যাসী হইয়া এই দুই প্রকার কার্য্যের অন্যথাচরণ করেন? এরূপ প্রশ্নে স্বামীজীকে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়াই প্রশ্নকারীদিগের বাস্তবিক আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল। ইহাও স্বামীজী পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার এ প্রশ্নোত্তরে ইচ্ছা না থাকিলেও পাছে কোন সরলচিত্ত লোকের মনে আশঙ্কা থাকিয়া যায়, এ বিধায় নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন। পরোপকারে যথার্থ উপদেশ দিবার আবশ্যক হইলে, যে পর্যান্ত সেই শুভসংকল্প সম্পন্ন না হয়, তাবৎ সন্ন্যাসী কোন বিশেষ স্থানে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিবে, ইহা শাস্ত্রবিধি। অনর্থক নিজ আরাম বা বিলাসিতা ভোগ জন্য সন্ন্যাসীর এক স্থানে অধিক দিবস থাকাই বেদ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। শুভ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য যদি সন্ন্যাসীকে যানারোহণ করিতে হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই উত্তর পাইয়া আর কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে কোন শব্দটী পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই।

স্বামীজী দেখিলেন যে, যখন দেশীয় পণ্ডিতগণ আর কোন রূপ শাস্ত্রার্থ করিতে উদ্যত নহেন, তখন তিনি তথাকার অঙ্গলদেশীয় বিদেশী পাদরী মহোদয়গণকে নিজনিজধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারার্থ সাদরে আহ্বান করেন এবং তথাকার তিনজন বিখ্যাত পাদরী পণ্ডিত যথা—রবিনসন্ সাহেব, গ্রেসাহেব ও কোলব্রেড সাহেব স্বামীজীর সহিত জীবব্রহ্ম ও সৃষ্টিকার্য্যবিষয় বিচার করেন। প্রথমে পাদরী মহোদয়গণই প্রশ্ন করেন। তাঁহাদের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর স্বামীজী অতি যোগ্যতা,যুক্তি ও তর্কের সহিত প্রদান করেন—যাহা শুনিয়া পাদরীত্রয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। একজন ইংরাজীবিদ্যানভিজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে কোনরূপ গোঁড়ামী বা অন্ধ বিশ্বাস নাই এবং প্রত্যেক উত্তর ঠিক প্রশ্নের অনুযায়ী

অর্থাৎ কোন কথা অপ্রাসঙ্গিক নহে দেখিয়া তাঁহারা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন। শেষে স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কোন বিষয়ের সামান্য পরিমাণেও ভ্রম বা নিগ্রহ স্থানে ফেলিতে না পারায় তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। তখন স্বামীজী বাইবেলসম্বন্ধীয় মোটামুটি দুই তিনটী মাত্র প্রশ্ন করিলেন যে, বাইবেললিখিত বিষয়ের কোন স্থানেই যীশুখৃষ্ট নিজকে পরমেশ্বর বলিয়া অথবা অনাদিকাল হইতে তাঁহার বিদ্যমানতা আছে কিম্বা তিনি" বাইবেললিখিত ত্রয়ী ঈশ্বরের একাংশ বা পৃথকাংশ তদ্বিষয় নিজ উক্তি দ্বারা বর্ণন করেন নাই। বরং ভূরি ভূরি স্থানে ইহার বিপরীতই বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহাকে যে খৃষ্টসম্প্রদায়ীগণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাহার কারণ কি? বরং বাইবেলের যীশু তাঁহার উপাসনা যেন লোকে না করে এবং তৎপরিবর্ত্তে সকলে স্বর্গীয় পিতারই উপাসনা করে,তাহারই উপদেশ বার বার দিয়াছেন—এই প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন—যীশুখ্রীষ্টকে ক্রূশে হত্যা করিবার পর তাঁহার পুনরুত্থান ও তৎপরে জীবিতাবস্থায় অর্থাৎ জীবিতশরীরে স্বর্গারোহণ বিষয়ের প্রমাণ কি এবং তাহা কিরূপে সম্পাদিত বা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার উত্তর দিন্? এই দুই প্রশ্নেরই উত্তর পাদরীগণ দিতে একেবারেই অসমর্থ হন ও শেষে বলেন যে, বাইবেলের যীশুকে অন্ধ বিশ্বাস করা ব্যতীত তর্ক-যুক্তি দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করা সুকঠিন। অবশ্য পাদরীগণ এই শব্দগুলি প্রয়োগ করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা "যাহা" বলিয়া উত্তর দেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল। যাহা হউক,তৃতীয় দিবস এই প্রশ্নোত্তরের পর আর পাদরীমহোদয়গণ স্বামীজী দয়ানন্দের সমীপে আইসেন নাই। তাঁহারা পুনঃ আগমন না করায় স্বামী ভদ্রতার অনুরোধে প্রতিসাক্ষাৎকরণের (return visit) জন্য স্বয়ং তাহাদিগের আলয়ে গমন করেন। পাদরীগণ অত্যন্ত সমাদর যত্ন ও সম্মানসহকারে তাঁহাকে স্বাগত করেন এবং তন্মধ্যে রবিন্সন্ সাহেব অতি ভদ্রতার সাহত প্রশ্ন করেন যে, পুরাণে ব্রহ্মার নামে যে পুত্রীহরণের কথা লেখা আছে, তাহা কি সত্য এবং যদি সত্য হয়, তবে কি তিনি সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ছিলেন? স্বামীজী তদুত্তরে বলিলেন যে, পুরাণাদিতে অনেক স্থলে মিথ্যা গল্প বর্ণিত আছে ও মধ্যে মধ্যে স্বার্থী বামাচারী লেখকেরা প্রায় প্রত্যেক দেবতার কোন না কোন রূপ নিন্দা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তৎপরে একগোত্র বা বংশপরম্পরা

অনেক সময় অনেক লোক এক নামেই প্রসিদ্ধ হন। যথা শঙ্করাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত গদীতে যে মহান্ত আসীন হন, তিনিই জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেইরূপ কোন বাজে ব্রহ্মানামক বামাচারী এরূপ কার্য্য না করিতে পারেন তাহারই বা বিচিত্রতা কি! পরন্তু বেদশাস্ত্রীয় ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার প্রাকৃত শরীর ছিল না, তাঁহাকে অকায় সর্ব্বত্রব্যাপী নাড়ী-বন্ধনাদিরহিত, অমূর্ত্তিমান্ অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য, ' অর্থাৎ যাঁহার পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর হয় না এবং যাঁহার কোনরূপ প্রতিমা বা তুলনা হইতে পারে না ইত্যাদি প্রকারে বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এজন্য এরূপ বৈদিক ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার পক্ষে কিরূপে এরূপ পাপকার্য্যকরণ সম্ভবপর হইতে পারে? একথা শুনিয়া পাদরী মহাশয় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, আপনাকে এখনও ইংরাজ-গণ চিনিতে পারেন নাই, এজন্য আমি আপনাকে একটী সার্টিফিকেট দিতে ইচ্ছা করি। আশা করি আপনি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। এই বলিয়া তিনি তাঁহার একটী সাক্ষরিত পত্রে স্বামীজীর বিস্তর প্রশংসা করিয়া লিখিলেন, "কোন ইউরোপীয় মহোদয় ইহাঁকে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মনে করিয়া তুচ্ছ জ্ঞান বা অবজ্ঞা না করেন। ইনি একজন অসাধারণ মহান্ ধার্ম্মিক বিদ্বান্ ও মহাপুরুষ। ইহাঁর বিদ্যা ও তর্কবুদ্ধি অগাধ। তৎপরে তিনি আজমীরের ডিপুটী কমিশনারের নামে ও রাজপুতানার রাজন্যবর্গের ইংরাজ-দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ Political এজেণ্ট মহাশয়ের নামেও দুইখানি পত্র দেন ও তাহাতে এই স্বামীজীকে যেন তাঁহারা বিহিত সম্মানসহকারে সৎকার করেন, তজ্জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়া দেন। এই পত্রেই বেশ বুঝা যায় যে, লোকে যতই দাম্ভিক হউক না কেন, বাস্তবিক গুণী ও ধার্ম্মিক পুরুষকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে।

স্বামীজীকে এই সার্টিফিকেট ও দুইটী প্রস্তাবনা (introductory letter) দেওয়ায় আজমীরের অনেক স্বামীজীর প্রেমী লোক অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি একবার এই দুইজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কারণ ইহারা যদি স্বামীজী বাস্তবিক কি পদার্থ একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে দুষ্ট লোকেরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াও গভর্ণমেণ্টের কানভারি করিতে চাহিলেও করিতে পারিবেনা; বিশেষতঃ সে সময় কোনরূপ বর্ত্তমান্

স্বরাজ বা অসহযোগের আন্দোলন ছিল না, বরং রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত একমত হইয়া যথার্থ দেশের উপকারে প্রবৃত্ত হওয়াই সাধারণ শিক্ষিতগণের মত ছিল। স্বামীজী স্বয়ং রাজনীতিকে ধর্ম্মাচরণ হইতে কোন পৃথক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন এবং তাঁহার এইরূপ দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল যে, জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত কার্য্য বৈদিক মতে ও সংস্কারানুযায়ী সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে আমরা ধর্ম্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারা ইহজীবনে পবিত্র সুখ-সম্পত্তি ও জ্ঞানাদিরূপী অভ্যুদয় প্রাপ্ত হই এবং তাহা ত্যক্তভাবে ভোগ করিয়া পরকালে নিঃশ্রেয়সরূপী সর্ব্বানন্দময় পরামুক্তি লাভে অধিকারী হইতে পারি। এই ভাবে কৃতকৃত্য হওয়াই মানব জীবনের কর্ম্ম, উদ্দেশ্য ও পরিণাম। যাহা হউক, তাহার পর স্বামীজী এই দুই প্রধান রাজকর্ম্মচারীর নামীয় পত্র লইয়া আজমীরে গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ইহাঁর নাম ও যশঃ বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত ছিলেন ও তৎপরে রবিন্‌সন্‌ সাহেবের পত্র মণিকাঞ্চনযোগরূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহাঁরা উভয়েই অনেক প্রকার প্রশ্নোত্তর করেন, পরে স্বামীজী উভয়কেই—গোরক্ষার উপকারিতা ও আবশ্যকতা বিষয় ধর্ম্ম শাস্ত্র ও বিশেষ করিয়া অর্থশাস্ত্রানুযায়ী অর্থাৎ (from an Economic point of view) বুঝাইয়া দেন এবং আক্‌বর আদি মুসলমান সম্রাটের সময় যেরূপ রাজাজ্ঞা দ্বারা গোবধ বন্ধ করা হইয়াছিল, তদ্রূপ করাইবার জন্য চেষ্টা করিবার প্রার্থনা করেন। কথিত আছে, ইঁহারা মুক্তকণ্ঠে গোবধ নিষেধের আবশ্যকতা-বিষয় স্বীকার করেন। পরন্তু শেষে অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে বলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্পষ্টভাবে রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে কোনরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; তাহার কারণ যখন কোরবাণী আদি মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত, তখন এরূপ আজ্ঞায় তাহাদের ধর্ম্মেও আঘাত করা হইবে। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে অসমর্থ। তৎপরে তিনি রাজন্যবর্গকে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার জন্য প্রার্থনা করেন, যেন তাঁহারা পৌরাণিক কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কথায় কথায় স্বামীজীর শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল যে, জয়পুরাধীশ তাঁহাকে নিজ বাসে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে লোকের কথায় অর্থাৎ

আমি মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, এজন্য সাক্ষাৎ করেন নাই, অথচ তাঁহার দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের খণ্ডন করাইয়া লন। ইহা শুনিয়া পলিটিকেল এজেণ্ট মহোদয় মহারাজ রামসিংহকে একটি (Private) অপ্রকাশ্য পত্র পাঠান যে, আপনার নিশ্চয়ই বড় দুর্ভাগ্য যে স্বামী দয়ানন্দের মত মহাত্মা ও মহাপুরুষকে আপনি আপনার রাজ্য ও বাটীতে নিমন্ত্রিত করিয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আমরা উক্ত মহাত্মাকে His Holiness অর্থাৎ তাঁহার পবিত্রাত্মা বলিয়া সম্বোধন করি এবং পত্রের শিরোনামায় তাহাই লিখিয়া থাকি। যাহা হউক, এই পত্র পাইয়া মহারাজ রামসিংহ যার পর নাই দুঃখিত ও পশ্চাৎ অনুতাপ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, স্বামীজী আজমীরে বৈষ্ণবাদি মতের সহিত শৈব মতেরও পূর্ণ খণ্ডনও করিয়াছিলেন।

এই সময় দুইজন ত্যাগী সন্ন্যাসী যাঁহারা নাগ পর্ব্বতের গুহায় তপস্যা করিতেন এবং যাঁহারা বিশেষ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহারা স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথোপ-কথনের পর বলেন যে, দেখুন আমরা চতুর্থাশ্রমী, আমাদিগের এ সময় কর্ত্তব্য যে আমরা সংসারের বাজে ঝগড়ায় না থাকিয়া কামক্রোধাদিকে দমনপূর্ব্বক পরমা-নন্দে তপস্যা করিতেছি,এজন্য প্রার্থনা করি, আপনিও আমাদিগের ন্যায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হউন। স্বামীজী উত্তর দিলেন যে আমি গুরু-আজ্ঞা পালন জন্য পাষণ্ড-মত মর্দ্দন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সত্য বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আমি কোনরূপ নাম-প্রকাশ বা অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছায় একার্য্যে ব্রতী হই নাই, মাত্র কর্ত্তব্যসাধন ও গুরু-আজ্ঞা পালন—ইহাই আমার উদ্দেশ্য। স্বামীজি তৎপরে আরও বলিলেন, আমার বিশ্বাস যে, এখনও আপনাদিগের উভয়ের মন হইতে পূর্ণরূপে অহঙ্কার ও অহমিকা বিদূরীত হয় নাই। তাঁহারা তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, না, আপনার কথা সত্য নহে। এ কথা শুনিয়া স্বামীজি হাস্যসহকারে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদায় প্রদান করেন। তৎপরেই তিনি তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মচারীগণকে ইঙ্গিত করিলেন যে, তোমরা কথায় কথায় ইঁহাদের সহিত কিঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্ক করিয়া কলহ করিবার চেষ্টা কর। গুরু-আজ্ঞায় শিষ্যেরা তাহাই করিল। তাহারা তখনই বাহির হইলেন এবং সন্ন্যাসীদ্বয়কে তর্কে ও বিচারে আহ্বান করিলেন। শিষ্য ব্রহ্মচারীগণ সন্ন্যাসী-

দ্বয়কে কিছু অবজ্ঞাসূচক (অবশ্য অপমানসূচক নহে) শব্দ প্রয়োগ করায় তাঁহারা উভয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বাক্ যুদ্ধ হইতে হইতে তাহা শারীরিক যুদ্ধে পরিণত হইয়া কুস্তম কুস্তি হইবার উপক্রম হওয়াতেই স্বামীজি আসিয়া তাঁহার বিশাল ভুজ দ্বারা দুই পক্ষকে পৃথক করিয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসীদ্বয়কে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভগবন্! আপনারা ত্যাগী, সুতরাং এই দুর্বুদ্ধি ব্রহ্মচারী ছাত্রদিগের বাক্যে নিজ শান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধ-পরবশে শাস্ত্রার্থ হইতে শস্ত্রার্থে প্রবৃত্ত হওয়া আপনাদের শোভা পায় নাই। তজ্জন্যই আমি পূর্ব্ব হইতে আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আপনারা এখনও সম্পূর্ণ রূপে নিজ মনের ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিতে সমর্থ হন নাই। এই কথায় তাঁহারা লজ্জিত হইয়া চলিয়া যান। এই সময় রামসনেহী সম্প্রদায়ের বড় মহান্ত, যাঁহার চেলা রাজপুতানায় বিস্তর আছে, তিনি আজমীরে আইসেন। স্বামীজি ইঁহাকেও বিচার জন্য আহ্বান করেন, পরন্তু ইনি বলিয়া পাঠান, আমরা বিদ্বান্ নহি, শাস্ত্রাদি পাঠ করিনা, কেবল মুখে রাম রাম জপ করিয়া থাকি ও যথাসময় ডাল রুটী আহার করি, শাস্ত্রাদির ধার ধারিনা; এজন্য আমার দ্বারা বিচার করা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক স্বামীজী তাঁহার সরলতার জন্য বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

যে হরিশ্চন্দ্র নামক পণ্ডিতকে স্বামীজি জয়পুরে শাস্ত্রার্থে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার একজন গুরুভাই (সহাধ্যায়ী) যিনি দিল্লী সহরে থাকিতেন, তিনি সহসা আজমীরে উপস্থিত হইয়া স্বামীজির সহিত মনুসংহিতা ও উপনিষদ্ বিষয় শাস্ত্রার্থ করেন ও স্বামীজির সহিত বিচার করিয়া তিনি এতদূর আহ্লাদিত হন যে, শেষে স্বামীজীর আতিথ্যসৎকার করেন।

কথিত আছে যে, এক দিবস এক জৈন পণ্ডিত স্বামীজির নিকট আসিয়া জৈনধর্ম্মসম্বন্ধে একটি পুস্তক দেন ও গুটীকত প্রশ্ন করেন। স্বামীজি প্রশ্ন-গুলির যথাযোগ্য উত্তর দিয়া বলেন, আপনার পুস্তক আমার নিকট রহিল, আমি ইহা পাঠ করিয়া পরে এই বিষয়ের মন্তব্য আপনাকে জানাইব এবং তাহার পরদিবস আসিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই জৈন পণ্ডিত স্বয়ং না আসিয়া মনে মনে ভাবিল যে, স্বামীজীর কাছে তাঁহার ধর্ম্ম পুস্তক থাকিলে তিনি তাহার নকল করিয়া লইবেন ও পরে খণ্ডনাদি করিবেন। তজ্জন্য জৈন পণ্ডিত ডিপুটি-

কমিশনার মহোদয়কে জানাইয়া তাঁহার পত্রসহ লোক পাঠাইয়া উক্ত পুস্তক ফিরাইয়া লন।

দয়ানন্দ স্বামী নিতান্ত অনন্যোপায় না হইলে স্ত্রীজাতিকে সম্মুখে বসাইয়া কখনও প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে উপদেশ দিতেন না। একবার অনেকগুলি ভদ্রমহিলা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে উপদেশ শুনিবার লালসায় উপস্থিত হয়; তাহাতে স্বামীজি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, মহিলাগণের কোন পুরুষের নিকট উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাদিগের নিজ নিজ পতিগণের নিকট উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য।

এই সময় জয়পুরাধীশ মহারাজ রামসিংহ আগরায় এক বড় দরবারে লাট মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগরায় যাইতেছিলেন। আগ্রা যাইবার পথে তাঁহার বৃন্দাবন দর্শন করিবার সংকল্প ছিল ও তথায় রঙ্গাচারী স্বামী—যিনি তথাকার বৈষ্ণবধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ—তাঁহাকে শাস্ত্রার্থে পরাস্ত করিবার জন্য স্বামীজিকে জয়পুরে ডাকাইয়া পাঠান। তখন স্বামীজী তাঁহাকে পত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, তিনি পূর্ব্বের মত পরিবর্ত্তন করিয়া শৈবমত ও মূর্ত্তিপূজার বিরোধী। তাহাই সত্য ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন। এরূপ উত্তরে অবশ্য মহারাজ কিছু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া ছিলেন ও রঙ্গাচারী স্বামীর সহিত বিচার করাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

স্বামীজী আজমীরের দুই এক জন ভক্তের অনুরোধে তথা হইতে কৃষ্ণগড় নামকস্থানে গমন করেন, তাঁহার ভক্তেরা স্বামীজিকে লইয়া শুভসাগর হ্রদের তীরে একটি আশ্রমে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

কৃষ্ণগড়ে সুযোগ্য পণ্ডিত কৃষ্ণবল্লভ জোশী ও মহেশদাস ওসওয়াল স্বামীজির বিশেষ সঙ্গ করিতেন ও মহেশদাস মহাশয় স্বামীজির আতিথ্যসৎকারের সমগ্রব্যয় বহন করিয়াছিলেন। এখানকার রাজা মহাশয় বল্লভাচারীর শিষ্য ছিলেন ও পূর্ব্ব হইতে শুনিয়াছিলেন, বৈষ্ণবসম্প্রদায় মাত্রেরই মত স্বামীজি খণ্ডন করিয়া থাকেন, এজন্য তিনি স্বামীজীর উপদেশ ও মত খণ্ডনে বিঘ্ন বাধা ঘটাইবার জন্য ঠাকুর গোপাল সিংহের সহিত পুটীকন্ত রাজপণ্ডিত ও গুণ্ডা সহ তাঁহার সমীপে পাঠাইলেন। স্বামীজী ইহাদের প্রকৃত মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এজন্য স্নানাদি সমাপনের পর শরীরে বিভূতি

লেপনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাষ্ঠাসনোপরি উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিতগণ একটী কাগজে কিছু লিখিয়া পত্রটি স্বামীজির হস্তে প্রদান করেন। স্বামীজি তাহাদিগকে উহা পাঠ করিতে বলেন, ইহাতে যাহা লিখিত ছিল, তাহার স্থূলার্থ এই, সর্ব্ব প্রকার প্রচলিত মত মধ্যে বল্লভমত শ্রেষ্ঠ ও সনাতন। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ যুক্তি. প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিবা মাত্র তাহারা কোন প্রকার উত্তর না দিয়া কেবল কোলাহল ও শাস্ত্রার্থের পরিবর্ত্তে শস্ত্রার্থের পূর্ব্ব লক্ষণ গালাগালি ও কুকথা বলিতে আরম্ভ করিল। তখন স্বামীজি গম্ভীর স্বরে একবার গর্জ্জন ও হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে একাকী পাইয়া শাস্ত্রার্থচ্ছলে আমার সহিত মারামারি করিতে উদ্যত হইয়াছ, পরন্তু জানিও আমি একাকীই তোমাদিগের সকলকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিতে সমর্থ। ইহাতেই তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিল। এমন সময় তথায় শ্রীমালীবংশীয় ৩০।৪০ জন ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পলাইয়া গেল। কৃষ্ণগড়ে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজি ঢুণ্ডু-রাজ মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তিন দিবস অবস্থান করেন। তথাকার লোকদিগকে উপদেশ দিবার পরে এক রাত্রি কাকুনামক স্থানে থাকিয়া পুনঃ জয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হন।

সশিষ্য জয়পুরে পৌঁছিয়া ঠাকুর অচরৌলের উদ্যানে রহিলেন। স্বামীজির জয়পুরে আগমন সংবাদ ঠাকুর রণজীৎসিংহ মহারাজ রামসিংহের গোচর করিলেন এবং মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী ও পণ্ডিত ব্যাস-বক্সীরামকে স্বামীজির নিকট প্রেরণ করিয়া রাজার পক্ষ হইতে প্রার্থনা করিলেন যে মহারাজের একান্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যে স্বামীজি কৃপা করিয়া রাজমন্দিরে কিছুদিন অবস্থান করেন। ইহা করিয়াও মহারাজ ক্ষান্ত রহিলেন না, পরে অচরৌলের ঠাকুর রণজীৎ সিংহকেও এ বিষয়ে অনুরোধ করেন যে যেন তিনি স্বামিজীকে কোন প্রকারে তাঁহার রাজ-সদনে আনয়ন করেন। এই-রূপ করিবার কারণ এই যে তিনি মহারাজ হইয়া যাচিতরূপে স্বামীজির নিকট যাওয়া কিঞ্চিৎ অপমানের বিষয় মনে করিয়াছিলেন। অবশ্য স্বামীজির অন্তরে মানাপমান কিছুই ছিলনা, পরন্তু লোকশিক্ষার জন্য কখন কখন তিনি লোকের

অহঙ্কার ভঙ্গ করিতেন ও তিনি যে কাহারও তোষামোদ করেন না, তাহারও পরিচয় দিতেন। অবশ্য তাহাতে তিনি কখন শিষ্টাচার হইতে বিচ্যুত হন নাই।

যাহা হউক, যদিচ দয়ানন্দ প্রথমে রাজবাটীতে অবস্থান করিবার জন্য স্বীকৃত হন নাই, পরন্তু তাঁহার প্রেমী রণজীৎ যখন তাঁহাকে অনুরোধ উপরোধ করিলেন, তখন তিনি রাজবাটীতে গিয়া তথায় মৌজ-মন্দিরে রহিলেন। এই সময় পণ্ডিতগণও তথায় সমবেত হইলেন, পরন্তু রাজা রামসিংহ কোন কারণ বশতঃ সে সময় অন্তঃপুরে গমন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই, তখন একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, রাজা মহাশয় আর এখন এখানে আসিতে পারিবেন না। এ কথায় স্বামিজী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পুনঃ অচরোল ঠাকুরের উদ্যানে চলিয়া যান। কথিত আছে, মহারাজ তৎপরে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া স্বামিজীকে তাঁহার প্রাসাদে আসিতে প্রার্থনা করেন, কিন্তু স্বামীজি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। রাজাও তাহাতে লজ্জাপরবশ হইয়া স্বামীজির নিকট অযাচিতরূপে যাইতে লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন—যদিচ তাঁহার স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

জয়পুরে স্বামীজি আশ্বিন মাসের প্রায় অর্দ্ধেক দিন অবস্থান করেন, পরে তথা হইতে আগরা গমনকালে ঠাকুর রণজীৎ সিংহ ও তাঁহার কর্ম্মচারী রামদয়াল অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহাকে বিদায় দেন। তাঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, ঠাকুর সাহেব! আমি আপনাকে সদা আনন্দময় থাকিতে উপদেশ দিয়াছি, কদাপি দুঃখিত হইতে উপদেশ দান করি নাই।
সম্বৎ ১৯২৩ বিক্রমাব্দের কৃষ্ণা কার্ত্তিকী নবমীতে স্বামী জয়পুর হইতে আগরা আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই সময় আগরায় দরবার হইবার কথা থাকায় তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিশেষতঃ রাজপুতানার প্রায় সমগ্র দেশীয় রাজন্যবর্গই তথায় সমবেত হইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন, কারণ তাঁহারা রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রাজন্যবর্গ ব্যতীত দরবারের তামাসা দেখিবার জন্যও দেশ বিদেশ হইতে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকসকল তথায় একত্রিত হন। স্বামীজি এই মণিকাঞ্চন যোগ অনর্থক ত্যাগ করেন নাই। তিনি এই সময় অত্যন্ত প্রবলতার সহিত সত্য-ধর্ম্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া দেন ও তৎসহ

ভাগবতাদি উপধর্ম্ম গ্রন্থেরও খণ্ডন করেন। আট পেজী এক ফর্ম্মা ভাগবত খণ্ডণের ট্রক্‌ট্ মুদ্রিত করিয়া হাজার হাজার বিনা মূল্যে বিতরণ করেন ও কয়েক সহস্র ট্রক্‌ট্ নিজ সঙ্গে আগামী হরিদ্বার কুম্ভমেলার সময় বিতরণার্থ রাখিয়া দেন কিছুদিন পরে তাহা সঙ্গে করিয়া মথুরায় লইয়া যান।

এইরূপে আগ্রায় প্রচার কার্য্য সমাপন করিয়া স্বামী দয়ানন্দ নিজ ছাত্র তিন চারি জন বিদ্যার্থীর সহিত মথুরায় আসিয়া পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রী১০৮ বন্দনীয় শ্রীবিরজানন্দ দণ্ডী স্বামীর শ্রীচরণ-কমল দর্শনার্থ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে পাদস্পর্শ করিয়া ২টী পুরাতন বাদসাই মোহর ও একখান উৎকৃষ্ট মলমল পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই দৃশ্যটী অতীব মনোহর। পূর্ব্বে ঋষিগণের আশ্রমে কোন শিষ্য গুরুপদ দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিলে যে দৃশ্যটী দেখিতে পাইত, আজ সেই দৃশ্য যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিরজানন্দের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহির্গত হইল। গুরুদেব দয়ানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। পরে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে দয়ানন্দ আনুপূর্ব্বীক সমস্ত ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া গুরুদেব যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। এইরূপে কিছুদিন গুরু-সান্নিধানে অবস্থান করিয়া স্বামী দয়ানন্দ পূর্ব্ববৎ ভৃত্যের ন্যায় গুরু সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু দণ্ডী স্বামী স্বয়ং এবং দয়ানন্দের শিষ্যগণ তাঁহাকে ঐ কার্য্যে বিরত করিলেন। সেবাদির সম্পূর্ণ ভার শিষ্যগণই গ্রহণ করিলেন। কয়েক দিবস পরে স্বামী দয়ানন্দ অতীব বিনয় সহকারে গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি তাঁহাকে আগামী হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যাইতে অনুমতি দেন ও আশীর্ব্বাদ করেন যেন তাঁহার শ্রীচরণ-কমলপ্রসাদাৎ পাষণ্ড মত মর্দ্দন করিয়া সত্য বৈদিক ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী হইতে সমর্থ হন। গুরুদেব তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গন করিলেন এবং কুম্ভমেলায় যাইবার আজ্ঞা দিবার সহিতও বলিলেন—তুমি সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়ী হইবে। স্বামীজির এই গুরুদর্শন তাঁহার জীবনে শেষদর্শন হইয়াছিল। গুরুপাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া স্বামী দয়ানন্দ শ্রীবিশ্বেশ্বরানন্দ

ও শ্রীশঙ্করানন্দ নামক দুইজন শিষ্যসহ হরিদ্বারে যাত্রা করিলেন, পথে যাইতে যাইতে মিরট সহরে উপস্থিত হন। তথাকার প্রতিষ্ঠিত গঙ্গারাম নামক নগর বাসীর সহিত গোরক্ষা সম্বন্ধে ও গোরক্ষিণী সভা স্থাপন সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হয়, তন্মধ্যে স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে,তিনি রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহারা ইহার বিরোধী নহেন, তবে প্রকাশ্যভাবেও ইহাতে যোগদান দিতে সম্মত নহেন, কারণ মহারাণীর আদেশ এই যে সরকার কোনরূপে কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কথিত আছে যে, স্বামীজি কুম্ভমেলায় যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এই সভা যথোপযুক্তরূপে স্থাপিত হয় নাই। তবে কতক পরিমাণে এই স্থানে গোরক্ষিণী সভা কিছুকাল জন্য স্থাপিত ছিল। পরে স্বামীজি মিরট হইতে হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হরিদ্বারে প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর এক পূর্ণকুম্ভের মেলা হইয়া থাকে। সেবার সম্বৎ ১৯২৪ বিক্রমাব্দে এই মেলা হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে এরূপ বৃহত্তম ধার্ম্মিক মেলা অন্যত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মেলায় ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্তগণ পৃথক্‌ভাবে এবং কোন কোন মহান্ত মহারাজেরা অত্যন্ত অধিক রাজসিকভাবে রাজঠাট ও তৎসঙ্গে হাজার হাজার স্ত্রী ও পুরুষ চেলা শিষ্যসহ সমবেত হইয়া থাকেন। এই মেলায় প্রায়ই বড় বড় মহান্ত মহারাজেরা "আমার দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এজন্য স্নানকালে আমার দল সর্ব্বাগ্রে স্নান করিবে ও তৎপরে অপর দল বা অপর দলের ঝণ্ডার বা পতাকার স্নান হইবে" এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই ব্যাপার লইয়া অনেক সময় মারামারি, দাঙ্গা ও খুনাখুনি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং সরকার বাহাদুরকে সিপাহী ও অস্ত্রধারী পুরুষ মোতায়ন রাখিয়া এই সমস্ত ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ী লোকদিগের মধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং অনেক সময় বহুচেষ্টা করিয়াও শান্তি-রক্ষায় অসমর্থ হন।

দয়ানন্দ সরস্বতী ১২ই মার্চ্চ ১৮৬৭ সাল, হরিদ্বারে পৌঁছিয়া ভীমগোড়া মহাদেবের মন্দিরের সন্নিকট সপ্তস্রোতের উপরিভাগে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন ও উক্ত পর্ণকুটীর সম্মুখে "পাষণ্ড-খণ্ডিনী" নামক পতাকা স্থাপিত করিয়া অকুতোভয়ে সত্যধর্ম্মের উপদেশ

করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ চলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত প্রচার দেখিয়া ও তাঁহার যুক্তি ও অকাট্য তর্কের বিষয় শ্রবণ করিয়া অনেকেই চকিত হইয়া উঠিলেন। এই সপ্তস্রোত হরিদ্বারের ঘাট হইতে ১॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও ভূরি ভূরি লোক প্রত্যহ তথায় উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হইতেন। সর্ব্বদাই তাঁহার কুটীরের সম্মুখে লোকারণ্য থাকিত। সেই সময় তাঁহার যশঃ এতদূর প্রসিদ্ধ হয় যে, কাশ্মীরের মহারাজা রণবীরসিংহ স্বয়ং স্বামীজির পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রের প্রকৃতার্থ কি? তাহা জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী তাহাকে ভাল করিয়া যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, পরমপুরুষ বা ব্রহ্মের বাস্তবিক মুখ হস্তপদাদি ছিল না বা নাই—যাহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই মন্ত্রে রূপক ও শ্লেষালঙ্কার দ্বারা বর্ণিত আছে যে মানবগণের মধ্যে যাহারা মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ (কারণ ব্রাহ্মণগ্রন্থে মুখশব্দ শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়) তাঁহারা ব্রাহ্মণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। বাহুশব্দে বল ও বীর্য্য বুঝায়, এজন্য জগতে যিনি বা যাঁহারা বাস্তবিক বলশালী, কর্ম্মদক্ষ ও দুর্ব্বলকে নাশ হইতে রক্ষা করেন তিনি বা তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। যাঁহারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যাদি করেন ও যাঁহারা বাস্তবিক অপরাপর মনুষ্যমাত্রেরই উদর বা পালক স্বরূপ, তাঁহারাই বৈশ্য। পাদ শরীরের নিম্নস্থ ভাগ, এজন্য মানবসমাজে যাহারা বিদ্যাবুদ্ধিহীনতা বশতঃ নিম্নস্তরে স্থিত, তাঁহারা পাদস্বরূপ শূদ্র। বেদশাস্ত্রে ব্রহ্ম "অকায়ম্" (শরীররহিত) অমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত আছে, তিনি নিত্য শুদ্ধ পরিণাম নাড়ী আদি বন্ধন রহিত সর্ব্বত্র বিরাজিত অপাপবিদ্ধ ও প্রতিমারহিত পুরুষ বলিয়া বর্ণিত। এজন্য স্বরূপ অপ্রতিমেয় থাকায় অমূর্ত্তিমান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধের শরীর থাকিতে পারে না, যাহা হইতে বা কোন বিশেষ অবয়ব হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। তৎপরে এই মহামেলাতে স্বামী দয়ানন্দ ভিন্ন ভিন্ন সাধুসম্প্রদায় মধ্যে যে সকল অবিদ্যা প্রচলিত আছে ও তজ্জন্য দেশের যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। লোকের স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িলে তাহারা ক্রোধে অধীর হন। বিশেষতঃ একজন সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসী দলের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া সকল সম্প্রদায়ীগণই তাঁহার (স্বামীজির)

উপর শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এরূপ সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া দয়ানন্দকে শাস্ত্রার্থে ঘোর বিচারের অবতারণা করিলেন। দয়ানন্দ একাকী এই বিচারাগ্নিতে ভারতের মিথ্যা শাস্ত্র ও সাম্প্রদায়িক মত সকলকে দগ্ধীভূত করিলেন এবং স্বার্থী মনুষ্যের প্রচারিত মত মতান্তরকে ভস্মীভূত করিবার প্রয়াস পাইলেন ও অবশেষে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া শ্রুতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মই যে সত্য ও সনাতন তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। পরন্তু বিচারপ্রসঙ্গে ইহা উত্তম রূপে বুঝাইয়াও তিনি সন্ন্যাসী কি সংসারী কাহাকেও বাস্তবিক নিজ সত্য মতের পক্ষপাতী করিতে সমর্থ হন নাই। উপস্থিত সকলেই মৌখিক হাঁ হাঁ করিল বটে, পরন্তু সকলেই পূর্ব্বে যেরূপ প্রচলিত মতের অনুরাগী এবং অনার্য্য গ্রন্থের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন, বিচারে পরাস্ত হইয়াও তাহা তাঁহারা ত্যাগ করিলেন না। বলিতে কি, স্বামী দয়ানন্দ যখন বেশ বুঝিতে পারিলেন, "মূর্ত্তি-পূজা অবৈদিকহেতু পাপজনক, ইহা যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়াও লোকে তাহা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে" তখন তাঁহার হৃদয় উদাসীনতার মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তিনি হতাশ ও ভগ্নোৎসাহী হইয়া পড়িলেন, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আর মিথ্যাবাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া শান্ত ও সমাহিত চিত্তে যোগ সাধনপূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া তিনি নিজ পুস্তকাদিকেও উপাধি ও অন্তরায় স্বরূপ মনে করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ভস্মানুলেপন করিলেন এবং কৌপীন পরিয়া মৌন হইয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, তিনি এই মৌন ব্রত অধিক দিন রাখিতে সমর্থ হন নাই। কিছুদিনের পর এক ভাগবত পণ্ডিত তাঁহার কুটীরে আসিয়া নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং" ইত্যাদি বাক্যে অর্থাৎ ভাগবত গ্রন্থ নিগম অর্থাৎ বেদরূপী কল্পবৃক্ষের সুমিষ্ট ফল অর্থাৎ ভাগবৎ গ্রন্থ বৈদিক ধর্ম্মের সারস্বরূপ এরূপ ব্যাখ্যা করায়, দয়ানন্দ এইরূপ অবৈদিক কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া ছিলেন।

সন ১৯২৫ বিক্রমাব্দে সহসা স্বামিজীর মনে এরূপভাবের উদয় হইল যে, তিনি এত কষ্ট ও তপস্যা করিয়া যে সত্য বিদ্যা শিক্ষা করিলেন, তাহা জগতের হিতার্থ প্রকাশ না করিয়া কৃপণের বা যক্ষের মত ধন সংগ্রহ করিয়া তাহার

সদ্ব্যবহার না করা অতি পাপ কার্য্য, এজন্য তিনি পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন।

তাঁহার চির বাঞ্ছা স্রোতস্বতীর বেগে ছুটিল। সত্যব্রতী মহাপুরুষ নিজ পর্ণকুটীর পরিত্যাগ করিয়া দেশ ভ্রমনার্থ বাহির হইলেন ও সর্ব্বাগ্রে হৃষীকেশ নামক পবিত্র তীর্থে গিয়া উপস্থিত হন। তথায় ৫।৬ দিবস অবস্থান করিয়া পুনঃ হরিদ্বারে আইসেন। তথা হইতে কন্‌খল্‌ হইয়া লণ্ডোরে আসিয়া অবস্থান করিলেন। এই লণ্ডোরে তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত নিরাহারে ছিলেন। যখন তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইত, তখন গঙ্গাতীরের এক ক্ষেত্রস্বামীর নিকট কিছু কাঁচা বেগুণ প্রার্থনা করিয়া লইতেন এবং সেই বেগুণ হইতে ৩টী বেগুণ খাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন। তৎপরে স্বামীজি লণ্ডোর হইতে যাত্রা করিয়া পথে শুক্রতাল ও পরীক্ষিত গড় অতিক্রম করিয়া পরিশেষে গড়মুক্তেশ্বরে আসিয়া পৌছিলেন। এই স্থানে তিনি সমাগত লোকসকলকে সরল সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ করিতেন। তথায় ১৫ দিবস অবস্থান করিয়া তৎপরে মীরপুরচাসী আদি স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শুক্ল বৈশাখি ১৯২৪ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ (১৮৬৭ সালে) কর্ণবাস নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই কর্ণবাস কম্পিলনগর নামে অভিহিত। কথিত আছে যে, এই স্থানে মহাভারত-লিখিত দ্রুপদরাজার রাজধানী ছিল। কর্ণবাসে কমলাপতি মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে স্বামিজীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই স্থানে স্বামিজীর সহিত পণ্ডিত জ্বালাদত্তের প্রথম সাক্ষাৎ হয়—যিনি স্বামিজীর শিষ্য হইয়া কিছুদিন বৈদিক যন্ত্রালয়ে গ্রন্থ সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত ও বেদভাষ্য প্রণয়ণকালে স্বামীজীর হিন্দী সংস্কৃত লেখক ছিলেন।

এই কর্ণবাসেই ভগবান দত্ত ভাগবত স্বামী দয়ানন্দের ভয়ানক বিরোধী হন এবং তজ্জন্য তিনি নানা দূরস্থিত পণ্ডিতগণকে একত্রিত করেন ও তৎপরে অনুপ সহরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অম্বাদত্ত বৈদ্য মহাশয়কেও বহুকষ্টে আনাইয়া স্বামীজীর সহিত ঘোর শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন। এই শাস্ত্রার্থে পণ্ডিত অম্বাদত্ত মহাশয় স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে, যাহা কিছু দয়ানন্দ স্বামী বলিলেন, তাহাই সত্য বৈদিক মত। তিনি আরও বলেন যে, হীরাবল্লভজী—যিনি একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ও বৈয়াকরণ, তিনি যদি স্বামীজির কথার অনুমোদন

করেন, তবে এ মত একান্ত প্রমাণিত হইয়া যায় যাহা হউক অম্বাদত্তের এ কথায় তথাকার উপস্থিত সজ্জনগণের মনে স্বামীজীর মত যে সত্য তাহার নিশ্চয় হইয়া গেল। স্বামীজী আগন্তুক জনমধ্যে অনেককে উপনীত হইবার জন্য আদেশ করেন। তাহাতে অনেক বৈশ্য ও ঠাকুর স্বামীজির কথানুসারে উপনয়ন ধারণ করিলেন। কথিত আছে যে সেই সময় অনুপসহর, দানাপুর, কর্ণবাস, অহমদগড়, রামঘাট, জাহাঙ্গীরাবাদ হইতে অনুমান ৪০ জন পণ্ডিত ডাকাইয়া যথারীতি হোমকুণ্ড নির্ম্মাণ করতঃ এক প্রকাণ্ড বৈদিক যজ্ঞ, অতি সমারোহের সহিত সমাপ্ত করা হয়, এবং তৎপরে অনেকের কণ্ঠীমালা নামাইয়া তৎস্থানে উপনয়ন ধারণের ব্যবস্থা করা যায়। এই যজ্ঞে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বামীজির নিকট আসিয়া সংস্কৃত হইতে লাগিলেন।

এস্থানে স্বামীজি নির্ভীকচিত্তে বলেন, "অষ্টগল্পো" অর্থাৎ আট প্রকার মিথ্যা গল্পকথা স্বরূপ, যথা—১ম, অষ্টাদশপুরাণ বাস্তবিক পুরাণ নহে, পরন্তু এইগুলি নবীন গ্রন্থ ও ইহারা মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক লিখিত নহে। ২য়,—প্রচলিত মূর্ত্তি পূজা বেদবিরুদ্ধ, এজন্য বাস্তবিক সনাতন রীতি বা পদ্ধতিযুক্ত নহে। ৩য়,—শৈব, শাক্ত, গানপত্য, বৈষ্ণব, সৌরাদি পঞ্চোপাসনা তথা রামানুজ বল্লভাচারী. ইত্যাদি নবীন সম্প্রদায়গুলি বেদ-প্রতিপাদিত নহে। ইহারা উপধর্ম্ম প্রচার করে। ৪র্থ—, তন্ত্র গ্রন্থ, বিশেষতঃ বীরাচারী ও বামাচারী তন্ত্রসকল আগম নামের উপযোগী নহে এবং ইঁহারা ভ্রষ্টাচার প্রচার করে। ৫ম,—মদ্য, মাংস অথবা অন্য কোনরূপ মাদক দ্রব্য ব্যবহার মহাপাতক ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ, মদ্যপান করা পঞ্চ মহাপাতকের অন্তর্গত। পরস্ত্রীগমন ও তন্ত্রের ভৈরবীচক্র অত্যন্ত অশ্লীল ব্যাপার ও সদা বর্জ্জনীয়। ৭ম,—চুরি করা অথবা কোনরূপ অক্ষক্রীড়া করা মহাপাতক এবং নষ্টচান্দ্র তিথিতে এবং দীপমালা উৎসবেও এই সকল কার্য্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ৮ম,—ছল, কপটতা, মিথ্যা ও বৃথাভিমান পরিত্যাগ না করিলে প্রকৃত ধর্ম্মযাজন করা যায় না। এজন্য এই অষ্টপ্রকার গল্প বা মিথ্যা ধর্ম্ম-যাজন সদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই স্থানে আর একটি বিচিত্র, বর্ণনাযোগ্য ঘটনা ঘটে। তাহা এই যে, পণ্ডিত হরিবল্লভ পার্ব্বতী নামক এক প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ অনুপসহর হইতে স্বামীজির নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত এই সর্ত্তে শাস্ত্রার্থ আরম্ভ করিলেন যে তিনি

শালিগ্রামশিলা তথায় রাখিয়া শাস্ত্রার্থ করিবেন এবং স্বামীজিকে তর্কে পরাস্ত করিলে স্বামীজিদ্বারাই উক্ত শালিগ্রামশিলার পূজা করাইবেন ও ভোগ দেওয়াইবেন। যাহা হউক সেদিন ধারাবাহি সমস্ত দিবস উভয় পক্ষের শাস্ত্রার্থ চলিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বিশেষ সিদ্ধান্ত হইল না। তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় ক্রমাগত ছয় দিবস পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থের পর পণ্ডিত হীরাবল্লভজী সরলান্তঃকরণে উচ্চৈঃস্বরে সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তাঁহার পক্ষ ভ্রমযুক্ত ও স্বামীজির পক্ষই সত্য ও বেদানুকূল। এই শাস্ত্রার্থের ফলে তথাকার মূর্ত্তিপূজক পণ্ডিতগণ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যান ও অনেক লোকে প্রকাশ্যভাবে শালগ্রাম-শিলা ও নর্ম্মদাশিলা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া দিলেন। তখনও তথাকার স্বার্থী ব্রাহ্মণ ও গঙ্গাপুত্রগণ স্বামীজির প্রতিঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হন, পরন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারেন নাই। এই স্থানে আর একটি ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণন করা আবশ্যক। একজন নবমবর্ষে বাল-বিধবা হন—এখন বৃদ্ধা, যিনি হংসাঠাকুরাণী নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি স্বামীজির পরমভক্ত ঠাকুর গোপাল সিংহের তাই (জেঠাই মা) ছিলেন, তিনি ৫।৬ গ্রামের অধিপত্নী হইয়াও যবের রুটী ও মুগের ডালমাত্র নিজহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। তাঁহাকে তথাকার ঠাকুরবংশীয় সকলেই "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্রমে ক্রমে যখন তথাকার সকলেই স্বামীজির মতাবলম্বী হইলেন, তখন উক্ত দেবীমাতা স্বামীজিকে দর্শনার্থ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে ঠাকুর গোপাল সিংহ স্বামীজির নিকট তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করেন, তাহাতে স্বামিজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হন। এই একমাত্র স্ত্রী (নারীকে) স্বামিজী নিজে প্রণবমাত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই বৃদ্ধা স্ত্রী মরণকাল পর্য্যন্ত প্রণব-মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন।

স্বামীজি মাঘমাসের শেষভাগে কর্ণবাস হইতে রামঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হন ও তথা হইতে গঙ্গাতীরে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পুনঃ ২০মে ১৮৬৮খৃষ্টাব্দে কর্ণবাসে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব নির্ম্মিত গঙ্গাতীরস্থ কুটীরে অবস্থান করেন। এই সময় জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে গঙ্গাতীরে প্রতিবৎসর এক মেলা হয় এবং তথায় স্নানার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেক পণ্ডিতের সহিত স্বামীজির গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্যের বিষয় বিচার হইয়াছিল এবং

তাহাতে স্বামীজি সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন যে, গঙ্গাস্নানে কদাপি মুক্তি লাভ হইতে পারে না ; ইহাতে বাহ্যিক শরীরের শুদ্ধি হয় মাত্র, পরন্তু কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ বিনা মুক্তিলাভ অসম্ভব। মুক্তিলাভ করা এত সহজ সুলভ ব্যাপার নহে যে, একবার মুখে হরিনাম জপ বা একবার গঙ্গাদি নদীতে অবগাহনে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন এখানে আর একটী বিশেষ ঘটনা ঘটে। এই গঙ্গাস্নান-মেলাতে রাও কর্ণসিংহও স্নানার্থ আগমন করেন। ইনি বৃন্দাবনের রঙ্গাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রাসাদি উৎসবে বিশেষ উৎসাহ প্রদান ও যোগদান করিতেন। এই রাওসাহেব স্বামীজির কুটীরের নিকটেই নিজ বাসা করেন ও সেই বাসস্থানেই রাসলীলা করান। রাওসাহেব একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। সমাগত পণ্ডিতগণ ভাগবত-খণ্ডন ও গঙ্গা-স্নানের মাহাত্ম্য-খণ্ডনে যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়া রাওসাহেবের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, দয়ানন্দ সরস্বতীকে যেন তেন প্রকারেণ দমন না করিলে সে এই সব খণ্ডন করিতে বিরত হইবে না। রাওসাহেব এই কথা শুনিয়া বিশেষ রাগান্বিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎসহ সশস্ত্র লোক লইয়া দয়ানন্দ স্বামীর কুটিরে উপস্থিত হইলেন। সে সময় অন্যান্য সমাগত শ্রোতাগণ শ্রীস্বামীজির শ্রীমুখাৎ অমৃতবাণী ও উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময় রাওসাহেব দলবল সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজি শিষ্টাচার সহ "আসিতে আজ্ঞা হউক" ইত্যাদি বলিয়া স্বাগত করিলেন। এইকথা শুনিয়াও রাওসাহেব অহঙ্কারে কিঞ্চিৎ মাত্র শিষ্টাচারের উত্তর প্রদান না করিয়া গ্রীবা উত্তোলন করতঃ বলিলেন, আমি কোথায় বসিব ? স্বামীজি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনি যেথানে ইচ্ছা বসিতে পারেন। রাওসাহেব বলিলেন যে, যেখানে তুমি বসিয়া আছ, আমি ঐ স্থানে বসিব। তখন স্বামীজি যে শীতলপাটীতে বসিয়া ছিলেন, তাহারই একপার্শ্বে সরিয়া গিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আসুন এইস্থানে অবস্থান করুন। তখন রাওমহাশয় বলিলেন, আপনাকে আহ্বান করা সত্ত্বেও আপনি কিজন্য আমার বাটীতে রাসলীলা দেখিতে যান নাই ? স্বামীজি উত্তর দিলেন, যেহেতু উহা গর্হিত কর্ম্ম বিবেচনা করি। ইহাতে রাওসাহেব বলিলেন, আমার রাসলীলা

দর্শনে সমস্ত পণ্ডিত-সন্ন্যাসীগণ আইসেন ও সম্মিলিত হন। ইহাতে স্বামীজি বলিলেন—আপনার সম্মুখে সামান্য লোকেরা নট-নটী সাজিয়া আপনার যাঁহারা সর্ব্বোপরি পূজ্য, তাঁহাদিগের রূপ ও বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য-গীত করিয়া থাকে, তাহা আপনারা দর্শন করেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই রূপ কার্য্যে আপনারা লজ্জা বোধ করেন না। এই কথার পরে রাওসাহেব বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, তুমি নাকি অবতার মান না, গঙ্গার মাহাত্ম্য স্বীকার কর না, বরং তাহার নিন্দা করিয়া থাক? আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, আমার সম্মুখে এইরূপ নিন্দা করিলে তোমাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিয়া তোমার অবস্থা শোচনীয় করিয়া দিব।

স্বামীজি অতি শান্ত ও নির্ভীক চিত্তে বলিলেন যে, আমি কাহারও নিন্দা করি না, যে দ্রব্য যেরূপ, আমি তদ্রূপ ভাবেই তাহা বর্ণন করি এবং সেই কথাই সদা নির্ভীকচিত্তে বলিয়া থাকি। গঙ্গার নাম কীর্ত্তনে ও গঙ্গায় স্নানাদিতে পাপ নাশ হয়, ইহা কোন প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই, ইহা সম্পূর্ণ কপোল-কল্পিত ও স্বার্থী লোকের বচন। তৎপরে স্বামীজি রাওসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার ললাটে রেখাবৎ উহা কি? তদুত্তরে রাওজী বলিলেন, উহা শ্রীরেখা, তৎপরে পুনঃ বলিলেন, যে জন বা যাহারা শ্রীরেখা ধারণ না করে, তিনি বা তাহারা চণ্ডালস্বরূপ। একথা শুনিয়া স্বামীজি প্রশ্ন করিলেন, আপনি এই শ্রীরেখা কতদিন হইতে ধারণ করিতেছেন? তাহাতে রাওসাহেব বলিলেন, কয়েক বর্ষ হইতে অর্থাৎ যখন হইতে তিনি রামাচার্য্যের শিষ্য হইয়াছেন, তখন হইতে ধারণ করিতেছেন। স্বামীজি পুনঃ জিজ্ঞাসিলেন, ইহার পূর্ব্বে কি আপনি বৈষ্ণব-মতাবলম্বী ছিলেন না? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তাঁহার বংশে তিনিই সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন, আপনার কথানুসারে আপনার মাতা-পিতাগণ যখন শ্রীরেখা ধারণ করিতেন না, তখন কি তাঁহারাও চণ্ডাল ছিলেন? এ কথা শুনিবা মাত্র রাওসাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া নিজ তরবারি কোষ হইতে উন্মোচন করিয়া বলিলেন, খবরদার, মুখ সামলাইয়া কথা বল। রাওসাহেবের কথাতে তাঁহার দশবার জন শস্ত্রধারী সঙ্গীও রাওসাহেবের সাহায্যার্থে দাঁড়াইলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া টীকারাম বড়ই ভাবিত হইলেন। পরন্তু স্বামীজি নির্ভীক-

চিত্তে বলিলেন, কেন অনর্থক ভয় পাইতেছ, আমি কোন কথা অসত্য বলি নাই।

তৎপরে রাও সাহেব স্বামীজিকে অনেক কুবচন বর্ষণ ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এই দেখিয়া স্বামীজি সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন, রাওসাহেব! আমি সন্ন্যাসী, আমার নিকট আপনার বীরত্ব দেখান শোভা পায় না। যদি তলবার খেলার শক্ থাকে, তাহা হইলে যোধপুর বা ঢোলপুরের রাণার নিকট গিয়া ঐ সাধ মিটাইয়া আসুন। আমি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী, আমরা শাস্ত্রীয় যুদ্ধ করি, শস্ত্রীয় যুদ্ধ করিনা; এজন্য যদি সাহস থাকে, তাহাইলে নিজ গুরুদেব রঙ্গাচার্য্যেকে আমার সম্মুখে আনয়ন করুন, আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব। তাহাতে রাওসাহেব বলিলেন, তোমার মত হাজার হাজার সন্ন্যাসী তাঁহার পাদুকা ঝাড়িবার জন্য প্রস্তুত আছে। স্বামীজি হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, শাস্ত্রার্থ করাইতে চাহেন, তবে আপনার গুরুকে আনয়ন করুন, নচেৎ বৃথা বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। আর যদি নিজবল দেখাইতে চাহেন, তবে জয়পুর বা যোধপুরে গিয়া নিজ রণ-কৌশল দেখান্।

একথা শুনিবা মাত্র, রাও ক্রোধে অধীর হইয়া অসি নিষ্কাসিত করিয়া, কুবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে স্বামীজিকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অরে ধূর্ত্ত, কি অনর্থ করিতেছিস? সাবধান হ" বলিয়া তাহাকে একটী ধাক্কা দেওয়ায় রাওসাহেব পড়িয়া গেলেন। তখন পুনরুত্থান করিয়া দ্বিগুণ ক্রোধে স্বামীজিকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিবামাত্রই স্বামীজি হঠাৎ তাঁহার হস্ত হইতে অসি কাড়িয়া লইয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ও একটি ধাক্কা দিয়া বলিলেন, যদিচ আততায়ী বধে দোষ নাই, তথাপি সন্ন্যাসী বিধায় আমি প্রতিশোধ চাহি না, অথবা লওয়াও কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু সেই ধাক্কা খাইয়াই রাওসাহেব ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যান। তখন স্বামীজি নিজে তাঁহার মুখে জল প্রক্ষেপ করিয়া ও পাখার দ্বারা ব্যজনপূর্ব্বক তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করাইয়া এইমাত্র বলিলেন, আপনি এখন প্রত্যাগমন করুন, ভগবান্ আপনাকে সুমতি দিউন। পাঠকগণ! আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, স্বামীজি কিরূপ উচ্চমনা ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার মনে লেশমাত্র প্রতিহিংসার ভাব ছিল না। তিনি যে যথার্থ সন্ন্যাসী ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

এই ব্যাপার ঘটিবার পর উপস্থিত দর্শকমাত্রেই রাওজিকে নিন্দা ও স্বামীজির ধৈর্য্য ও শান্তি-প্রিয়তার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, রাজকর্ম্মচারী বা পুলিশকে রিপোর্ট করিয়া ভবিষ্যতে যেন আর এরূপ অত্যাচার না হয়, তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য ও রাওজিকে দণ্ড দেওয়ান উচিত। স্বামীজি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সন্ন্যাসীর সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল হওয়া কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার প্রতিরোধ করিয়া অনিষ্টকারীকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, দয়াপরবশ হইয়া, তাহার অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া, তাহার উপকারে প্রবৃত্ত হওয়াকেই ক্ষমা বলা যায়। রাও যদিচ নিজে ক্ষত্রিয়ত্ব পালন করেন না, তাই বলিয়াই কি আমাকে নিজ ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে? যাহা হউক, এই ব্যাপার কর্ণবাসের সকলেই শুনিলেন ও কর্ণবাসের ঠাকুর কৃষ্ণ সিংহের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি গুটিকতক লাঠিয়াল ও বলিষ্ঠ লোককে রাও সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্রামের ও অন্যান্য লোক তাহাদের সহিত একত্রিত হইয়া রাওসাহেবের নিকট গিয়া তাঁহাকে যথোচিৎ ভৎর্সনা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, যদি ভাল চাও, শীঘ্র পালাও; নচেৎ তোমার দুর্দ্দশার শেষ করিব। যাহা হউক, রাওসাহেব পরদিবসেই ভয়ে পালাইলেন, পরন্তু তাঁহার পাপের কর্ম্মফল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিল। যেহেতু নিজগৃহে গিয়া তিনি হঠাৎ কঠিন রোগগ্রস্ত হন ও তাহাতেই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, পরে তিনি পাগল হইয়া যান। এমন কি শেষে বৈষ্ণব হইয়াও মদিরা পান ও মাংস ভক্ষণাদি মন্দ কর্ম্মে রত হন। একটা মোকর্দ্দমায় সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহার ৪০।৫০ হাজার খরচ হয় ও পরে সেই মোকর্দ্দমায় হারিয়া যান। ফলে শেষদশায় তাঁহাকে অতি কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সংবাদ যখন স্বামীজির নিকট একজন যাইয়া জ্ঞাত করে, তখন স্বামীজি দুঃখিত হইয়া বলেন, ভগবানের লীলা বিচিত্র, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করিতে, কোনরূপ মিষ্ট কথা বা তোষামদে বশীভূত হইয়া, নিজ কর্ত্তব্য ত্যাগ করেন না। রাওসাহেবের এই দুর্দ্দশায় আমাপেক্ষা অতি অল্প লোকই দুঃখিত হইয়া থাকিবেন। আমি তাঁহার আত্মার কল্যাণার্থে ভগবানের নিকট সরলান্তঃ-করণে প্রার্থনা করি; কিন্তু ভগবান নিজ কর্ত্তব্য ও সত্য বিচার আমার কথায় খণ্ডন করেন নাই। পাঠক! স্বামীজির এই মহত্ত্বের প্রতি একবার দৃষ্টি

করুন এবং ইনি যে একজন মহাপুরুষ ও যথার্থ ত্যাগী ও যোগী ছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যবহারেই বুঝা যায়। এই স্থানে ধর্ম্মপুরের একজন রহীস অর্থাৎ বড়লোক কোন কারণবশতঃ মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার ন্যায় নরাধমকে তিনি শুদ্ধ করিয়া লইতে পারেন কি না? তাহাতে স্বামীজি বলেন, অনায়াসে করিতে পারা যায়, যদি তুমি বৈদিক ধর্ম্মের পুনরাচরণ করিতে পার। সেই সময় সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হওয়ায় স্বামীজি তত্রাগত যাত্রীগণকে গঙ্গাস্নান বিষয় ও যথার্থ তীর্থ কাহাকে বলে? তদ্বিষয় উপদেশ দেন। এইরূপে স্বামীজি কর্ণবাসে কিছুকাল থাকিয়া পরে গঙ্গা-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে চাশনী পৌঁছিলেন। এস্থানে পণ্ডিত নন্দরাম নামক এক চতুর ব্রাহ্মণ তথাকার জাটগণকে চক্রাঙ্কিত মতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও অনেককে তাঁহার মতও গ্রহণ করান। পরন্তু তথাকার এক প্রসিদ্ধ ছিতর সিং নামক জাট নন্দরামকে বলিল যে, দয়ানন্দ স্বামী এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রমুখাৎ যদি আপনি বলাইতে পারেন যে, এই চক্রাঙ্কিত মত সত্য, তবে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। এ কথায় উক্ত পণ্ডিত স্বামীজির নিকট গিয়া তাঁহার মূর্ত্তি দেখিবা মাত্রই ভয়ে দৌড়িয়া পালাইতে লাগিলেন, তাহাকে ধরিবার জন্য লোকসকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, পরন্তু কেহ তাঁহাকে স্বামীজির সমীপে লইয়া আসিতে পারিল না। তাহার পর ঐ পণ্ডিত সেখানে বা তন্নিকটস্থ কোন স্থানে আর কখন দর্শন দেন নাই। স্বামীজি এই ব্যাপারে চক্রাঙ্কিত মতের সজোরে খণ্ডন করেন ও তাঁহার অনেক নূতন শিষ্য ঐ মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই স্থানে স্বামীজি আট দিবস অবস্থান করিয়া তৎপরে তথা হইতে অনুপসহরে গমন করিয়া শ্রীবল্লভের কুটীরে অবস্থান করিলেন। এক সময় স্বামীজি একটী মাত্র কৌপীন ধারণ করিতেন, অঙ্গে কোনরূপ বস্ত্রাদি রাখিতেন না। তিনি এইস্থানে রাত্রি দুইটার সময় গঙ্গাস্নান করিয়া সমাধিতে মগ্ন হইয়া তদবস্থায় বেলা ৭টা পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিতেন। পরে সমাগত লোককে উপদেশ দিতেন। কথিত আছে, এক দিবস জনৈক ভক্ত তাঁহাকে তাহার হস্তরেখা দেখিতে অনুরোধ করেন ও আর একজন তাহার জন্মপত্র বা কোষ্ঠীপত্র আনিয়া তাঁহাকে দেখান। স্বামীজি উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলেন (জন্মপত্র কিমর্থং কর্ম্ম-

পত্রং শ্রেষ্ঠং) জন্মপত্রিকা কিজন্য আনিয়াছ, ইহাতে কোন ফললাভ নাই। উত্তম কর্ম্মানুষ্ঠান কর, মঙ্গল হইবে। আরও বলিলেন প্রারব্ধ অপেক্ষা পুরুষকার অধিক বলবান্। প্রারব্ধের উপর নির্ভর করিয়া কদাপি পুরুষকারে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কথিত আছে, এই অনুপসহরে এই সময় রামলীলা অতি ধূমধামের সহিত হইত। সে বার রামলীলাতে স্বামীজি অত্যন্ত যুক্তি ও তর্ক দ্বারা লোককে এরূপ ভাবে বুঝাইয়া ছিলেন যে, "তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়া গেল"। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, পুরুষোত্তম মর্য্যাদাবান মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র তথা বীরোত্তম শ্রীলক্ষ্মণ ঠাকুর ও মহামতী মহারাণী শ্রীমতী সীতাদেবীর মূর্ত্তি সামান্য যাত্রাওয়ালার ছেলে-দের দ্বারা সাজাইয়া নৃত্যগীতাদি করান ও ভিক্ষা চাহান কি তাঁহাদিগকে বাস্তবিক অপমান করান হয় না? যাহা হউক, স্বামীজির উপদেশে এই রামলীলা তথায় পরবর্ষ হইতে বন্ধ হইয়া যায়। একজন মুসলমান তহসিলদার আসিয়া স্বামীজিকে বলেন যে, মুসলমানেরা সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল, কারণ তাঁহারা মূর্ত্তি-পূজা করে না। তাহাতে তিনি বলিলেন, পীর মানা ও তাহার পূজা দেওয়া অথবা তাজিয়া করা কিম্বা প্রতিদিন মক্কাভিমুখে নেমাজ পড়া ও তথায় প্রস্তর চুম্বন করা পূর্ণ বুৎভারতী বা মূর্ত্তিপূজা, এজন্য ইহা একপচ্ আর ধস্ কার কর গুণ-যশ কথনের ন্যায়।

এই স্থানে স্বামীজির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া একজন ব্রাহ্মণ পানের ভিতর বিষ প্রদান করিয়া ঐ পান স্বামীজিকে খাইতে দেন। স্বামীজির যদিচ পান খাইবার অভ্যাস ছিল না, তথাপি তিনি ভদ্রতার অনুরোধে খাইয়া পরে জানিতে পারিলেন যে, তাহাকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। একারণ তিনি তৎক্ষণাৎ যোগের ন্যৌলীক্রিয়া * দ্বারা বিষ বমন করিয়া ফেলেন।

এই বিষ-প্রয়োগ-সংবাদ তথাকার তহশীলদার মহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনাইয়া তাহাকে হাজতে রাখিয়া সেই সংবাদ স্বামীজিকে দেন ও তৎপরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় তদন্ত কালে স্বামীজিকে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজি তদুত্তরে তহশীলদার

* ন্যৌলি ক্রিয়া দ্বারা যোগিগণও নাড়ী ধৌত করিতে পারেন ও পাকাশয়কে বাহির করিয়া জল দিয়া ধৌত করিয়া পুনঃ যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারেন।

মহাশয়কে বুঝাইয়া দেন যে, সত্য বটে সে ব্যক্তিগত তাঁহার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে, পরন্তু তিনি (স্বামীজি) জগতের বন্ধন ছাড়াইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য কাহাকেও কয়েদ দিতে চাহেন না, বরং উক্ত দুষ্ট ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্বামীজির প্রার্থনায় উক্ত তহশীলদার অনিচ্ছা সত্বে ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণকে ধমকধামক দিয়া শেষে ছাড়িয়া দেন।

এই সময় অনুপসহরের গঙ্গাতটে অনেকে তর্পণার্থে আসিয়াছিলেন। এই সমস্ত তর্পণকারীগণকে স্বামীজি সাদরে ডাকিয়া উপদেশ দিতেন,তোমরা কি জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছ, এবং কিজন্যই বা জল হইতে জল লইয়া জলেই ঢালিতেছ ? জল ত সাক্ষাৎ নিম্নদিকেই যাইতেছে। পিতৃব্যদিগের জন্য উর্দ্ধে গমন করিতেছে না। এজন্য বৃথা কেন এ কষ্ট স্বীকার। যদি এই জল তরুণ বৃক্ষে সেচন করিতে,তবে কালে সেই বৃক্ষ ফলবান হইয়া সুমিষ্ট ফল প্রদান করিত। এই স্থানে অনেক সমাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বামীজির নিকট বৈদিকসন্ধ্যাবিধি শিক্ষা করেন ও লিখিয়া লয়েন এবং অনেকে নিত্য সন্ধ্যা ও হোমাদি কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে দুই চারি দিবস অন্যত্র গিয়া পুনঃ অনুপসহরে আসিতেন, পরে এইস্থান হইতে যাত্রা করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে রাজঘাটে গমন করিয়া তথায় গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন।

এই স্থানে তিনি গঙ্গাস্নানের পর সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার প্রায়ই পদ্মাসনে আসীন হইয়া বেলা ৯।১০টা হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ধ্যান ও সমাধিতে বিলীন থাকিতেন। তাঁহার এই ব্যাপার দেখিয়া তথাকার ও আশপাশের লোকের মধ্যে তৎসম্বন্ধে মহান্ চর্চ্চা চলিতে লাগিল। এই সময় ক্ষেমকরণ ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত রামচন্দ্র স্বামীজির দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত অর্দ্ধশ্লোক পাঠ করিলেন "ধ্যানবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ" এই কথা শুনিয়া স্বামীজি হাসিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলে ক্ষেমকরণ বলিতে লাগিলেন,এস্থলে কোন আশ্রয় নাই ও সন্ধ্যা উপস্থিত, তামসী রাত্রি অনুভূত হইতেছে, একারণ কোন আশ্রয়ে যাওয়া উচিত,এই বলিয়া তাঁহারা বনখণ্ডী মহেশ্বরের মন্দিরে স্বামীজিকে আনয়ন করিয়া তথায় অবস্থিত করাইলেন। এই স্থানের পণ্ডিতগণ স্বামীজির সহিত সামান্য কথা-বার্ত্তার পর বিচারে পরাস্ত হইয়া বহু কষ্টে কুরুক্ষেত্র সরস্বতী যিনি হঠাৎ তৎস্থানে

আসিয়াছিলেন ও যাঁহার বিদ্বতার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইহাঁকে স্বামিজীর সহিত শাস্ত্রার্থ করিবার জন্য আনয়ন করেন এবং তথায় রামকৃষ্ণাদির অবতার বিষয় অর্থাৎ ইঁহারা পরমাত্মা ছিলেন, অথবা মহাযোগেশ্বর ও প্রতাপী পুরুষোত্তম ছিলেন তদ্বিষয়, এবং মহাদেব ও পার্ব্বতী কৈলাসে থাকেন বা মন্দিরে থাকেন? এই দুই বিষয়ের বিচারে কৃষ্ণচন্দ্র কিছুই বলিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে স্বামিজী তথা হইতে ১৯৩০ বিক্রমীয় অগ্রহায়ণ মাসে, আতরৌলী উপস্থিত হইয়া, তথায় কিছু প্রচার করিয়া ভৈরব মন্দিরে অবস্থান করতঃ উপদেশ দেন। এখানে স্বামীজি দুইবার আইসেন। আতরৌলী হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীজি ছলেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ছলেশ্বরের ঠাকুর মুকুন্দ সিং নামক একজন প্রসিদ্ধ জমীদার, ইতঃপূর্ব্বে কর্ণবাসে স্বামিজীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভক্ত হন। ইনি নিজ জমিদারীর মধ্যে যে চামুণ্ডানামক মহাদেব, এবং মগরসেন লাংগুর পথওয়ারী ও সৈয়দ আলি ইত্যাদি স্থানে আরও যে প্রায় ২০।৩০টী মূর্ত্তি, যাহা তিনি নিজে স্থাপন করেন, ও যাহা বহুকাল হইতে যথারীতি পূজিত হইত, সেইগুলিকে কালিন্দী-নদীর প্রবাহে প্রবাহিত করেন। এই কার্য্যে প্রায় ৬০ গ্রামের চৌহান রাজপুতগণ বিশেষ রাগান্বিত হইয়া গণ্ডগোল করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন; পরন্তু সত্যের এমনিই প্রভাব যে তাঁহারাও স্বামিজীর উপদেশ শুনিয়া শান্ত হইয়া যান। এই স্থানে রাজা জয়কৃষ্ণ দাস C. S. I. মহাশয়ও স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শঙ্কা সমাধান করেন। এই স্থানে স্বামিজী, তাঁহার গঙ্গাতীরে বিচরণ কালে, তিনবার আগমন করেন, যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। রাজা জয়কৃষ্ণজী স্বামিজীকে সঙ্গে লইয়া আলীগড়ে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে চক্রাঙ্কিত ধর্ম্মের খণ্ডন ও বৈদিক ধর্ম্মের মণ্ডন করেন। শেষে সোরো পৌঁছিয়া অম্বাগড়ে অবস্থান করিলেন। কথিত আছে এই স্থানে প্রায় ১০ হাজার ব্রাহ্মণ—যাহারা ইতঃ পূর্ব্বে চক্রাঙ্কিত ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন,—তাহারা স্বামিজীর উপদেশে উক্ত মত পরিবর্ত্তন ও কণ্ঠিমালা ত্যাগ করিয়া, বৈদিক সন্ধ্যাদি কার্য্যে রত হন ও গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যান ও পুরশ্চরণ আরম্ভ করেন। এই ব্যাপারে সেখানে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। পরিশেষে বৈষ্ণব-মতাবলম্বীগণ তথাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক মহাভাগবত

পণ্ডিত শ্রীঅঙ্গদরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের শরণাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, সম্প্রতি সোরোতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়ান ভার, যে কেহ তর্ক করিতে যায়, সেই পরাস্ত হয়। এক্ষণে তাহাকে আপনি নিজ মতে লইয়া আসুন, নতুবা তাহার জ্বালায় আর মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করা যায় না। কলির পূর্ণমাত্রা হইয়াছে। আপনি মহান্ ভাগবত, আপনি বিনা এ যাত্রা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা অপরের সাধ্য নহে। কথিত আছে, এই অঙ্গদ-শাস্ত্রী স্বামিজীর কর্ণবাসে অবস্থান কালে, নিজ প্রশংসা-সূচক নিম্ন লিখিত শ্লোক লিখিয়া পাঠান, যথা :—

শেষঃ পাতালকে চাস্তি স্বর্লোকে চ বৃহস্পতিঃ।
পৃথিব্যামঙ্গদঃ সাক্ষাৎ চতুর্থো নৈব দৃশ্যতে॥

অর্থাৎ শেষনাগ একজন মহাপণ্ডিত পাতালে অবস্থান করেন। দেবলোকে এক গুরু বৃহস্পতি পণ্ডিত আছেন। পৃথিবীতে এক আমি সাক্ষাৎ অঙ্গদ আছি, এতদ্ব্যতীত চতুর্থ পণ্ডিত কুত্রাপি নাই। কথিত আছে, স্বামিজী অঙ্গদ শব্দের আট প্রকার খণ্ডন লিখিয়া পাঠাইয়া তাঁহার অহঙ্কার ও অভিমান চূর্ণ করেন। এ জন্য পণ্ডিত অঙ্গদ সহসা দয়ানন্দের সম্মুখবর্ত্তী হইতে আর সাহসী হ'ন নাই। কিন্তু যখন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি অগত্যা শাস্ত্রার্থ করিতে স্বামিজীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যাহা হউক এ স্থলে বিস্তারের ভয়ে আমি সমগ্র শাস্ত্রার্থ বর্ণন করিব না, আশয় মাত্র বর্ণন করিতেছি। স্বামিজী বেদ ও সৎশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা মূর্ত্তিপূজা যে বেদ বিরুদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় তাহা, প্রমাণ করিয়া ভাগবত পুরাণের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। তৎপরে ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম শ্লোকই "কথিতো বংশ-বিস্তারোভবতা সোমসূর্য্যয়ো" ইত্যাদি যে সকল শব্দ লিখিত আছে, তাহাতে বিস্তার শব্দ বাস্তবিক অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের রীত্যানুসারে অশুদ্ধ ও বিরুদ্ধ প্রমাণ করিলেন ও ভাগবতের অন্যান্য অনেক দোষ দর্শাইলেন, যাহা শুনিয়া পণ্ডিত অঙ্গদরাম শাস্ত্রী স্বামিজীর কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া তাহার প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্বসমক্ষে বলিয়া উঠিলেন, দেখুন এই সন্ন্যাসী যাহা বলিতেছেন, তাঁহার প্রত্যেক কথা বেদবাণীবৎ সত্য এবং বাস্তবিকই শালগ্রামাদি মূর্ত্তির পূজা ও ভাগবতাদি গ্রন্থ অশাস্ত্রীয়। এজন্য আমি অদ্য হইতে এই দুইটী পরিত্যাগ করিলাম। পরে তিনি যে শালগ্রাম-শিলা বহুকাল হইতে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সকলের

সমক্ষে, (স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিয়া) গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভাগবত পাঠ—যাহা তাঁহার জীবিকা ছিল—তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিয়া স্বামিজীর পূর্ণমতাবলম্বী হন এবং প্রত্যহ পঞ্চ-মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত অঙ্গদরামকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও মহা বিদ্বান্ বলিয়া জানিতেন; তজ্জন্য তাঁহার এই কার্য্যে অনেকে নিজ শালগ্রাম-শিলা ও বাণলিঙ্গকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে, এই সময় স্বামিজীর এক প্রিয় সহাধ্যায়ী পণ্ডিত যুগলকিশোর, যিনি স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তিনি এখানকার বৃত্তান্ত মথুরায় গিয়া স্বামী-বিরজানন্দের নিকট জ্ঞাপন করেন যে, দয়ানন্দ সোরো গিয়া তথায় কণ্ঠি-তিলক ধারণের ও পুরাণোক্ত শালগ্রাম পূজার খণ্ডন করিতেছেন। তাহাতে তিনি হাস্য করিয়া বলেন, বাস্তবিক শালগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ যথা—শালীনাং গ্রামঃ শালিগ্রামঃ—অর্থাৎ শালীধান্যের ঢেরী, অতএব তাহার পূজা নিষ্ফল।

অঙ্গদশাস্ত্রী সরলান্তঃকরণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে কৈলাসপর্ব্বত স্থাপিত বরাহ-মন্দিরের বরাহদেবের মূর্ত্তির প্রশংসায় অনেক শ্লোকযুক্ত কবিতা লিখিয়া পাঠান। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে পুরাণ মিথ্যা ও ব্যাসদেব কৃতঃ নহে, তখনই তিনি বৈদিক মত গ্রহণ করিয়া, সেই কৈলাস-পর্ব্বতের নিকট তাঁহার পূর্ব্বমত খণ্ডনার্থে অনেক শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। কৈলাস-পর্ব্বত ইহা পাঠে মহাক্রোধ পরবশ স্বয়ংও পিলিভিত আদি স্থান হইতে অনেক পণ্ডিত সংগ্রহ করিয়া, নিজ পক্ষ সমর্থনে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরন্তু কেহই দয়ানন্দরূপ প্রচণ্ডাগ্নির সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন নাই; সকলেই পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। ইহাদের মধ্যে একজন মাত্র মনুসংহিতা হইতে পুরাণ ও প্রতিমা শব্দ বাহির করিয়া স্বামিজীর নিকট বলায়, তদুত্তরে স্বামিজী তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, এ স্থানে পুরাণ শব্দে নবীন অষ্টাদশ পুরাণ নহে বা বুঝায় না, পরন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থ নারাশংসি আদি, ও প্রতিমা অর্থে তুলায়মান পদার্থ অর্থাৎ বাটখারা বুঝায়। তৎপরে স্বামীজি সোরো অম্বাগড় হইতে যাত্রা করিয়া সহবাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার এক বৈরাগী স্বামিজীর উপদেশে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া তথাকার সরকারী নম্বরদারের (নম্বরদার এক প্রকার রাজকীয় গ্রাম্য-মণ্ডলের ন্যায়) নিকট গিয়া স্বামিজীকে হত্যা করিবার জন্য তলওয়ার চাহিল। অ-শ্র তিনি

তলওয়ার না দিয়া স্বামিজীর নিকট সমস্ত বিষয় জানাইলেন। স্বামিজী বলিলেন, কোন ভয়ের কারণ নাই, পরমাত্মা তাঁহার রক্ষক, এজন্য তিনি কোন মনুষ্যকে ভয় করেন না। কথিত আছে, এখানে অনেক প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরা স্বামিজীর মত গ্রহণ করেন। এখানে অবস্থানকালে পূজনীয় স্বামিজী পূজনীয় গুরুদেবের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। কাশগঞ্জ নিবাসী পণ্ডিত চৈনসুখ আদি কয়েকজন স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে জ্ঞাত করেন যে, মথুরায় শ্রী১০৮ বিরজানন্দ সরস্বতী দণ্ডীস্বামী সংবৎ ১৯২৫ বিক্রমী আশ্বিন কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে স্বর্গবাস করিয়াছেন। এই মহান্ শোকময় সংবাদ শুনিয়া দয়ানন্দ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন, "আজ সংস্কৃত বিদ্যা ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সূর্য্য অস্তমিত হইল।"

গুরুদেবের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর আর তিনি তথায় অধিক-কাল অবস্থান না করিয়া, কাকোড় নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। এই গ্রাম, জেলা বদাঁওর অন্তর্গত গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এস্থানে কার্ত্তিক মাসে গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। এই মেলাতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। এই স্থানে স্বামিজী বৈদিকমত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মেলাতে কালেক্‌টারসাহেব স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও নিজ টুপি খুলিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বামীজির সহিত ইহার কিছুক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর, তিনি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া চলিয়া যান। পরে কতকগুলি মৌলবী সাহেব আসিয়া স্বামীজির সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন ও তাহারাও স্বামীজিকে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত জানিয়া সেলামাদি করিয়া চলিয়া যান। তৎপরে পাদরী মহোদয়গণ ও এই মেলা উপলক্ষে আসিয়া স্বামীজির সহিত প্রশ্নোত্তর করেন। তাঁহারাও তাঁহাদের প্রশ্নের কাটা কাটা উত্তর পাইয়া শেষে পশ্চাৎপদ হইয়া আর স্বামিজীর নিকট আসিতেন না। এইস্থানে স্বামীজি অনেক সাধু উদাসী ও বৈষ্ণব বৈরাগী আদিকে তাহাদিগের ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া সত্য বৈদিক পথে আনয়ন করিতে সমর্থ হন। ককোড় ঘাট হইতে স্বামিজী কম্পিল হইয়া কায়েমগঞ্জ নামক স্থানে পৌছিয়া তথায় আবার বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করেন। এখানেও খৃষ্টান পাদরীর সহিত সহিত তাঁহার বিচার হয় এবং তাঁহারা নিরুত্তর হন। এই স্থানে

লালা কৃষ্ণপ্রসাদ তহশীলদার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাগবত গ্রন্থ সত্য কি মিথ্যা? স্বামীজি বলিলেন ইহা একবারে মিথ্যা। এ কথায় যদিচ তাঁহার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল বটে, পরন্তু স্বামিজী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহাতে দুঃখ করা উচিত নহে, বরং সুখী হওয়া কর্ত্তব্য। কয়েমগঞ্জে প্রচার কালীন পণ্ডিত বলদেব প্রসাদ গুটীকত অতিকূট প্রশ্ন স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেন, যথা:—যদি পশুবধ করা হিংসা হয় তবে, রাজারা কিরূপে হিংস্র পশুবধ করিতেন? ইহার উত্তরে স্বামীজি বলেন যে, রাজধর্ম্ম সন্ন্যাস ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, রাজার পক্ষে প্রজা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এজন্য দুষ্ট বন্য জন্তু যথা বন্যবরাহ ও ব্যাঘ্রাদি পশু, গো বধ ও মনুষ্য প্রভৃতির নানা প্রকারে হানি করে, এজন্য দুষ্টের প্রাণ-দণ্ড-বিধি বেদানুমোদিত। তখন পণ্ডিতজী বলিলেন যে, বৃদ্ধ পিতা মাতা বা যখন কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্টপান, অথবা বৃদ্ধ গো বা বলদ যখন কোন কাজ করিতে পারে না, কেবল বসিয়া খায়, তখন অনর্থক খরচ বাড়াইবার জন্য উক্ত গবাদিকে মারিয়া তাহার মাংসাদি কাহাকেও খাইতে দেওয়া ও তাহার চর্ম্মকে অপর কাজে আনা কিজন্য পাপ-জনক হইতে পারে? স্বামিজী বলিলেন ইহাতে কৃতঘ্নতা দোষ ঘটে ও তৎপরে পরমাত্মা মনুষ্যগণের জীবিত পিতা মাতার সেবা করা যে বৈদিক ধর্ম্ম ও তাহারা কৃপা পূর্ব্বক যে সেই সাধনের সুযোগ পান, এজন্য তাহাদিগের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন। লোকে নিজ কুকর্ম্মের ফলজন্য কদর্য্য রোগ গ্রস্ত হয়, অথবা জন্মান্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করে, একারণ এরূপ লোককে কি পাপী বলিয়া ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে? উঃ পাপী তাহার পাপ ভোগ করিতেছে সত্য, পরন্তু এতদবস্থাতেও পরমাত্মা কৃপা করিয়া মানবের উত্তম বৃত্তি যথা দয়া দাক্ষিণ্যাদি প্রকাশের সুযোগ দেন, যাহাতে তাহারা ঐ সকল উত্তম বৃত্তির পরিচালনা করিয়া নিজে, শারীরিক মানসিক ও আত্মিক উন্নতি করিতে সমর্থ হই। যাহা হউক, এরূপ উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মন হইতে ক্রূরতা দূরীভূত হয় নাই। তিনি বিচারে পরাস্ত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে হাঁ বলিয়া চলিয়া আসিয়া, সকলকে স্বামীজির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন ও কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কাশীর পণ্ডিতগণের নিকট হইতে স্বামিজীর মতের বিরুদ্ধে মত ক্রয় করিয়া আনাইলা, ফরক্কাবাদে যখন স্বামিজী

গমন করেন তথন তথায় বিরোধ করিবার জন্ত যত্নবান হন, যাহা পরে বর্ণন করিব।

প্রসিদ্ধ পাদরী গুড্‌মান সাহেবের সহিত স্বামীজির পাপ,বিনা ভোগে,ক্ষয় হইতে পারে কিনা? তদ্বিষয় বিচার হয়। পাদরী মহাশয় বলিতেন যে লোক যতই পাপী হউক না কেন, যদি সে যীশুকে এই বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে যে, যীশু নিজ প্রাণ, জগতের পাপ-ক্ষয় জন্ত ক্রুশে উৎসর্গ করেন, এবং সেই রক্তপাত দ্বারা তিনি স্বর্গীয় পিতার নিকট হইতে জগতের পাপ নিবৃত্তি করাইয়া লইয়াছেন ; এজন্ত যে কেহ যীশুকে পরিত্রাতা বলিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে ও নিজকৃত পূর্ব্ব পাপ জন্ত মনে মনে পরিতাপ করিবে, সেই মুক্তি পাইবে। অপরে মহাজ্ঞানী এবং মহা নিঃস্বার্থী ও পরোপকারী বা কেবল ঈশ্বর ভক্ত হইলেও,কেহই মুক্তি পাইতে পারে না। যীশুর আগমনের পূর্ব্বে বাইবেলের ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে যদি কেহ গুটীকত ঘুঘু, পায়রা, ছাগ ও মেষ আদি পশুপক্ষি হত্যা করিয়া তাহাদের রক্ত পবিত্র মন্দিরের বেদীতে ছড়াইয়া দিত, ও উক্ত পশুমাংস অর্পণ করিত, তাহা হইলে, পরমাত্মা তাহার সমস্ত পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিতেন এবং যীশুও সেই জন্ত নিজ শরীরের রক্ত পাত করাইয়া পিতার নিকট হইতে মানব মাত্রেরই পাপ ক্ষমা করাইয়া লয়েন। যাহা হউক, স্বামীজি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, ঈশ্বর তোষামদে বশীভূত হইয়া বা পাপের পরিবর্ত্তে কোনরূপ প্রতিগ্রহণ করিয়া পাপক্ষয় করেন না। তিনি তাঁহার নিরপেক্ষতা ও যথার্থ ন্যায়কে কদাপি অন্যায়ে পরিণত করেন না। যতদিন জীব ঈর্ষা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত-চিত্ত হইয়া অপরের হিতকেই নিজ হিত বলিয়া জানিতে সমর্থ হইয়া, নিজস্বরূপের ও পরমাত্মার বিষয় যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত না হইবেন, তাবৎ তাহার মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। পরমাত্মার সৃষ্টিতে যেজন যেরূপ কর্ম্ম করিবে,তদনুযায়ী তাহাকে তদ্বিষয়ের ভোগ ও অবশ্য ভুগিতে হইবে। বিনা ভোগে কর্ম্মক্ষয় হয় না অর্থাৎ "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্" করিতেই হইবে। তবে যোগবল দ্বারা সেই কৃত কর্ম্ম সকল অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ে ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে পারা যায়॥

কথিত আছে। এখানে আর একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী যিনি প্রায় লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া এক শিবমন্দির স্থাপন জন্ত প্রস্তুত হয়েন, তিনি স্বামীজির

উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তথায় শিবমূর্ত্তি স্থাপন না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে এক সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করেন। সে সময় অপরাপর মন্দিরে যেরূপে যাত্রীর ভিড় হইত, স্বামীজির উপদেশে তথায় একবারে কমিয়া যায়। এই স্থানে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটে। পশ্চিমে সাধু নামক একজাতি গৃহী সাধু, আছে। ইহারা যদিচ সাধারণকে দীক্ষা দেয় পরন্তু, তাহাদের হস্ত প্রদত্ত জল বা অন্ন তাহাদের হিন্দু শিষ্যগণ গ্রহণ করে না। একদিন উক্ত সাধু পবিত্র ভাবে অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীজির নিকট আনিলে, তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। ইহাতে সকলে তাঁহাকে বলেন, একি অনর্থ করিলেন ? স্বামীজি হাসিতে ২ বলিলেন প্রথমতঃ; সাধু সন্ন্যাসীর কোন বিশেষ জাতি নাই, তৎপরে অন্ন দুই প্রকারে দূষিত হয় যথা—প্রথমতঃ যদি কোন লোককে কষ্ট দিয়া ঐ অন্ন পাওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ ঐ অন্নে যদি কোন দূষিত বা মলিন পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই অন্ন সাধুর নিজ ধর্ম্মোপার্জ্জিত ও তৎপরে সে পবিত্রতার সহিত এই আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে, এজন্য ইহা সেবনীয়। আপস্তম্ভ ঋষি বলিয়াছেন "সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানানাং ভোক্তব্যম্" এবং "আর্য্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রা সংস্কর্ত্তারঃ স্যুঃ" অর্থাৎ সকল বর্ণেরই অন্ন ভোজ্য যদি সে বা তাহারা স্বধর্ম্ম নিরত থাকে এবং আর্য্যগণের গৃহে ও অধ্যক্ষতায় শূদ্রগণ পবিত্রাচারে সংস্কার বা রন্ধন কার্য্য করিবে।

কায়মগঞ্জ হইতে স্বামিজী ফরক্কাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তথায় জগন্নাথ লালার বিশ্রান্তঘাটে অবস্থান করেন। সংবত ১৯২৪ সালে স্বামিজী সর্ব্বপ্রথমে যখন ফরক্কাবাদে আইসেন তখনও এই বিশ্রান্তঘাটেই অবস্থান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার পৌষ ১৯২৫ সংবতে কায়মগঞ্জ শমসাবাদ আদি স্থান পরিভ্রমণ ও তথায় উপদেশ করিয়া এইস্থানে আইসেন। পূর্ব্বেই বর্ণন করিয়াছি যে স্বামিজী এসময়, মাত্র একটী কৌপীন ধারণ করিতেন, অন্য কোনরূপ বস্ত্রাদি অঙ্গে রাখিতেন না। ফরক্কাবাদে স্বামিজীর নিকট শত শত লোকে প্রতিদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এখানে অনেক পণ্ডিতগণও "মনুসংহিতাদি" পুস্তক স্বামিজীর নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। সম্পূর্ণ সহরে স্বামিজীর বার্ত্তা সর্ব্বত্রই প্রচারিত ও আন্দোলিত হইত। বিশেষতঃ, এই স্থানে স্বামিজী অনেককে যজ্ঞোপবীত ধারণ করান। লালা জগন্নাথজী মহাশয়ের যজ্ঞোপবীত ধারণকালে

একাদশ জন পণ্ডিত প্রতিদিন এক সহস্র গায়ত্রীর পুরশ্চরণ জন্য নিয়োজিত হন। স্বামীজি যজমানকেও এক সহস্র জপের উপদেশ দেন ও উপবাসী থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন। এই জপাদিকর্ম্ম ও বৃহৎ-হবন-কার্য্য স্বামী নিজ পর্য্যবেক্ষণে সম্পন্ন করান। একাদশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন হবনাদি হইতে লাগিল এবং একজন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া স্বামিজী তাঁহার দ্বারাই লালা মহাশয়কে 'গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ করান। এই যজ্ঞের ফল অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়, যেহেতু অনেকেই কণ্ঠীমালা পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে পান্নালাল নামে একজন ভদ্রলোক, প্রায় প্রতিদিন রাত্রিকালে স্বামিজীর নিকট আসিয়া উপদেশ লইতেন ও সরলতার সহিত প্রশ্নোত্তর করিতেন। স্বামীজি যদিচ অপরের সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন, পরন্তু ইহার সহিত হিন্দিতেই কথাবার্ত্তা কহিতেন। মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে মতপ্রচার হওয়া, ইতিপূর্ব্বে যে মূর্ত্তিপূজার সাপক্ষে কাশী হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে লইয়া তথাকার অনেক স্বার্থীলোক পণ্ডিত বলদেব প্রসাদসহ একত্রিত হইয়া গঙ্গাপুত্রাদি গুণ্ডাগণকে উত্তেজিত করতঃ, এক মিছিল বাহির করিলেন ও তৎসঙ্গে অনেক লাটীয়াল লইয়া স্বামিজীর দমানার্থে বাহির হন। পরন্তু স্বামিজীর সম্মুখীন হইয়া তাহার প্রশান্ত ও নির্ভীক মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইলেন না। মাত্র কেবল পথে পথে স্বামিজীর নিন্দা, কুৎসা ও গালাগালি দিয়া চলিয়া গেল। ইহার ফল বিপরীত হইল, সকলেই বুঝিলেন ইহারা স্বার্থ-পরবশ হইয়া এরূপ করিতেছে, পরন্তু স্বামিজীর পক্ষ সত্য ও ধর্ম্মযুক্ত। বিশেষতঃ লালা দুর্গা প্রসাদকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করার জন্য এবং জীবন্ত পিতা মাতার সেবা করা ও উত্তমোত্তম ভোজন ও পানীয় প্রদান করাই যে যথার্থ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, এইরূপ প্রচার করায়, তথাকার পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া মীরট নিবাসী পণ্ডিত গোপালজীকে আনাইয়া শাস্ত্রার্থের দিবস স্থির করিয়া পণ্ডিত পীতাম্বর দাসকে মধ্যস্থ করিয়া শাস্ত্রার্থ করান। এই শাস্ত্রার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইতেছে যথা—মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭৬ শ্লোকে লিখিত আছে—

"নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধান মেবচ"॥ মনু

অর্থাৎ প্রতিদিন স্নান করিয়া শুচি হইয়া দেবতা ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে এবং দেবতা-অর্চ্চনা ও সমিদাধান (যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা হোম) করিবে। এ স্থানে দেবতা-অর্চ্চনা থাকায় মূর্ত্তিপূজার বিধান আছে বলিয়া পণ্ডিত গোপালজী সিদ্ধান্ত করেন। স্বামিজী বলিলেন, প্রথমতঃ দেবতা বলিলে মূর্ত্তি বুঝায় না, দিব্যগুণযুক্ত পুরুষ বা বিদ্বানাদি বুঝায়। তৎপরে "অর্চ্চপূজায়াম্" এই ধাতু হইতে অর্চ্চন শব্দ সিদ্ধ হয়, যাহার অর্থ. সৎকার করা। এস্থানে বিদ্বান্ পুরুষ-দিগের অর্চ্চন বা পূজন অর্থাৎ সৎকার করা বুঝায়। যাহা হউক গোপাল-পণ্ডিত শাস্ত্রার্থে পরাস্ত হইলে, ইতঃপূর্ব্বে কাশীর পণ্ডিতদিগের নিকট ক্রয় করা মূর্ত্তিপূজা বিষয়ক পাঁতি লইয়া, তথাগত শালগ্রাম শাস্ত্রী নামক জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত, যিনি গভরমেণ্ট আজমীর কালেজের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তিনি ও জ্বালাপ্রসাদ নামক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ, যিনি তখন সেখানে ডাক্‌মুনসীর কাজ করিতেন এবং একজন প্রসিদ্ধ মদ্যপায়ী ছিলেন ইঁহারা, একত্রিত হইয়া এক নোটীশ ছাপাইয়া ও তৎসহ কাশীস্থ পণ্ডিত-দিগের ব্যবস্থার একটা নকল লইয়া, অতি সমরোহের সহিত গঙ্গাতীরে গিয়া ঢোকাঘাট যাহা স্বামীজীর বাসস্থানের নিকট অবস্থিত তথায়, "ধর্ম্ম ধ্বজেয়ম" এই বাক্য একটা নিশানে লিখিয়া এক ঝণ্ডা গড়িয়া তাহাতে লট্‌কাইয়া দিয়া দয়ানন্দ স্বামীকে অযথা-শব্দ দ্বারা গালাগালি দিতে লাগিলেন। পরে যখন পুলিশ কোতওয়াল আসিয়া তাহাদিগের কোলাহল বন্ধ করিয়া দিলেন ও বলিলেন যে, মেলাতে এরূপ অন্যায় করিলে তোমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইব তখন সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তৎপরে কয়েক জন স্বামীজিকে হত্যা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, পরন্তু তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। তথায় স্বামীজিকে মনে করিয়া দুষ্ট লোকেরা বলপূর্ব্বক অপর একজনকে খাটিয়াসহ জলে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। যখন সেই সাধু চীৎকার করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, আমি অমুক সাধু, আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার কি জন্য করিতেছ? তখন তাহারা সকলে বুঝিল ইনি অপরসাধু, দয়ানন্দ নহেন। স্বামীজিও সেই চীৎকারে জাগিয়া উঠিলেন, এবং উক্ত সাধুকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন। স্বামীজির সহিত দুষ্ট লোকেরাও সাধুর উদ্ধারার্থ জলে নামিয়া ছিল। ভগবানের অনুকম্পায় কোনরূপে সেই সাধু রক্ষা পাইলেন।

আর একবার দশহরার দিন সেই স্থানেই স্বামীজিকে হত্যা করিবার জন্য অনেকে সমবেত হইয়া যখন তাঁহাকে আশ্রমের চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছিল, তখন তথায় একজন পাহাড়ী কামার্থী (যাহারা নিজ বা অপরের কামনা-পূর্ণের জন্য মানত করিয়া গঙ্গাজল লইয়া কোন দূরস্থিত মহাদেবের মাথায় অর্পণার্থ পদব্রজে দূর দেশে গমন করে) আরাম করিতে ছিল। সে দেখিল স্বামীজিকে হত্যা করিবার জন্য কয়েকজন দুষ্ট লোক আসিয়াছে, তাহাতে সেই লোকটী নিজ কুকুরকে লেলাইয়া দিয়া ও নিজেও এক লাঠী লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। স্বামিজী বাহিরে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন। তখন তিনি, মাত্র একটী হুঙ্কার করায়, কে কোথায় পালাইয়া গেল, তাহার আর নিদর্শন পাওয়া গেল না। যাহা হউক পণ্ডিত গোপালজীর সহিত শাস্ত্রার্থে কাশীর লিখিত পণ্ডিতগণের সমস্ত প্রমাণগুলিকে স্বামীজি যখন তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়া দিলেন, তখন প্রসিদ্ধ ধনী প্রেমদাস দেবীদাস, কানপুরের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত হলধর নামক এক মৈথিল ব্রাহ্মণ, (যাঁহাকে তৎকালে সকলে ভারতের মধ্যে ব্যাকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেন), উক্ত পণ্ডিতজীকে, স্বামীজির সহিত শাস্ত্রার্থ জন্য কানপুর হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তিনি এরূপ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন যে স্বামীজির কয়েকজন প্রেমী তাঁহাকে পরামর্শ দেন, হলধর ঝা ব্যাকরণ শাস্ত্রকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া নুতন করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার সহিত কেহ ব্যাকরণে সম্মুখীন হইয়া আজ পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন নাই। অতএব ব্যাকরণে তাঁহার সহিত আপনার শাস্ত্রার্থ করিবার প্রয়োজন নাই। যদি আপনি পরাস্ত হন, তবে আপনার সমস্ত মান সম্ভ্রম ভঙ্গ হইয়া যাইবে। স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, আমি মান অপমান জন্য শাস্ত্রার্থ করি না। আমি সত্য স্থাপন জন্য তর্ক ও শাস্ত্রার্থ করিয়া থাকি। যদি কেহ আমার ভ্রম দর্শাইতে পারেন, আমি তাঁহাকে গুরু পদে বরণ করিয়া, তাঁহার নিকট তদ্বিষয় শিক্ষা করিব। পরন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। গুরুর কৃপায় আমি ব্যাকরণ বিষয় যাহা শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে কেহই আমাকে তর্ক করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে না। যাহা হউক, শাস্ত্রার্থের দিন ও স্থান স্থিরীকৃত হইল। হলধর বামাচারীও ধূর্ত্ত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে স্বামীজি সন্ন্যাসী ও নির্ধন, এজন্য তিনি শাস্ত্রার্থে জয়-পরাজয়ে টাকার পণ

রাখিতে চাহিলেন। হলধরের পক্ষে অনেক সাহুকার মহাজন ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন আমরা এই শাস্ত্রার্থের জন্য পণের টাকা জমা রাখিতে পারি। স্বামীজি উত্তর দিলেন, আমি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে কামিনী কাঞ্চন বর্জ্জনীয়, আমি টাকা কোথায় পাইব? আমার মাত্র আর্থিক ভরসা কৌপীন ও নিজ শরীর। আমি ইহাই পণ রাখিতে পারি। যদি আমি পরাস্ত হই, জেতার নিকট ভৃত্যবৎ থাকিব, নচেৎ তিনি পরাজিত হইলে তাঁহাকে সর্ব্ব সমক্ষে বামাচার মতের মূর্ত্তি-পূজা বর্জ্জন করিতে হইবে, এবং তিনি আর ইহ জন্মে কথনও কোন রূপ অবৈদিক কার্য্য করিতে পারিবেন না। যাহা হউক আমি সত্য নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রার্থ করিতে চাহি, পণের টাকার হার জিতের উপর শাস্ত্রার্থ করিতে প্রস্তুত নহি। তাহাতেও যখন তাঁহারা পণের টাকায় বিষয়ে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন স্বামীজির এক প্রিয় ভক্ত লালা জগন্নাথ দাস আড়াই হাজার টাকা লইয়া তথাকার বিখ্যাত রইস ও Banker লালা প্রেম দাস দেবী দাসের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন ও বলিলেন, স্বামীজি যদি বিচারে পরাস্ত হন, তবে আমি স্বামীজির পক্ষ হইতে এই টাকা হারিয়া যাইব, আর যদি জয়ী হ'য়েন, তাহা হইলে অপর পক্ষ হইতে লইব। তখন প্রেমদাস দেবীদাস দেখিলেন যে এত বড় ভয়ানক কথা হইল, বিচারে আমাদের যে নিশ্চিত জয় হইবে, তাহার স্থির কি? তখন তিনি বলিলেন যে আমরা সত্য নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রার্থ করাইতে চাহি, অতএব হার-জিত জন্য পণ রাখিতে ইচ্ছুক নাহি। যাহা হউক শেষে স্থির হইল যে, সন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ জুন তারিখে, পণ্ডিত হলধর ঝা, প্রতিষ্ঠিত ১৫ জন পণ্ডিত সহ, স্বামীজির স্থানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রার্থ করিবেন। পরে উক্ত দিবস তাঁহারা স্বামীজির সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, স্বামিজী তাঁহাদিগকে অতি সমাদরে স্বাগত এবং স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন হলধর ঝা স্বামীজিকে প্রণাম করায়, তিনি হলধরকে "আনন্দরহো" অর্থাৎ আনন্দে থাকুন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যদিও শাস্ত্রার্থের বিষয় মূর্ত্তি পূজা ছিল, কিন্তু হলধর বামাচারী তান্ত্রিক বিধায়, সর্ব্বাগ্রে সুরা বা মদিরা-পান যে শাস্ত্র-সঙ্গত, তাহারই প্রমাণস্বরূপ বলিলেন "সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ" অর্থাৎ সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরাপান করা কর্ত্তব্য। স্বামিজী সুরাপান করা মহাপাতকের অন্তর্গত ও বাস্তবিক ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে যে একবারে নিষিদ্ধ,

তাহা বর্ণন করিলেন। ইহা ব্রহ্মতেজ নষ্ট করে,এরূপ মন্বাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে, এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও সুরাপানের বিরুদ্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে,এখানে সুরা শব্দে মদিরা বুঝায় না,পরন্তু সোমরস বা সোমবল্লী রসপানের বিধান আছে। তৎপরে স্বামিজী এ বিষয়ে তাঁহাকে পরাস্ত করায়, হলধর পণ্ডিত স্বামিজীকে সন্ন্যাসীর লক্ষণ কি? প্রশ্ন করিলেন, যাহা তিনি অতি সুন্দর পরিস্কার রূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে স্বামিজী পণ্ডিত মহোদয়কে ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, হলধর ঝা তাহা সম্যক বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। কারণ তিনি দেখিলেন, যদি ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ বলেন, তাহা হইলে বামাচার পদ্ধতিতে বিশেষ বাধা পড়ে। তৎপরে তিনি অপ্রতিভ হইয়া অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন! তখন স্বামীজি বলিলেন যে, কৃপা পূর্ব্বক "ভাষায়াং বদ, ভাষায়াং বদ" অর্থাৎ আপনি আপনার ভাষায় কথাবার্ত্তা করুন, কারণ আপনার কথিত সংস্কৃত ঠিক হইতেছে কিনা তাহার প্রতি চিন্তা থাকায় প্রকরণ-বিষয় ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না। আপনার সংস্কৃতে অনেক অশুদ্ধ শব্দ বাহির হইতেছে. একারণ ভাষায় কথোপ-কথন করুন। যাহা হউক তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার বৈয়াকরণ নামে কলঙ্ক ঘটিতেছে. তখন তিনি একবারে হতাশ হইয়া অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা বলিতে লাগিলেন ও তাহাও অশুদ্ধ সংস্কৃতে কথিত হয়। তখন স্বামিজী পুনরায় বলিলেন "ভো হলধর! ভাষায়াং বদ প্রকরণং বিহায় মাগচ্ছ"। অর্থাৎ হে হলধর! ভাষায় কথা বলুন ও প্রকরণ ছাড়িয়া অপর কথা বলিবেন না। একথায় উত্তরে হলধর বলিলেন "অহং তু প্রকরণং বিহায় ন গচ্ছামি পরন্তু শ্রীমতাং পুনঃ পুনঃ প্রকরণমভিনয়তে, তর্হি প্রকরণশব্দস্য কথং সিদ্ধিঃ" অর্থাৎ আমি প্রকরণ ছাড়া অপ্রমাণিক কথা বলি নাই, পরন্তু আপনি বার বার প্রকরণ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন এজন্য বলুন,প্রকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? অর্থাৎ কিরূপে ইহা সিদ্ধ হয়। ইহার উত্তরে স্বামীজি বলিলেন,প্র উপসর্গ পূর্ব্বক ডুকৃঞ করণে ধাতুতে লুট প্রত্যয় করিলে প্রকরণ শব্দ সিদ্ধ হয়। তখন হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন, ধাতু সকল সমর্থ হয় বা অসমর্থ? স্বামীজি উত্তর দিলেন, পানিনীয় সূত্রে ধাতু সমর্থ হয়, যথা—"সমর্থঃ পদ বিধিঃ"। তবে অসমর্থ কাহাকে বলে? একথা ওঝাজী জিজ্ঞাসা করায়, স্বামীজি বলিলেন "সাপেক্ষোঽসমর্থো ভবতি" অপেক্ষাকারী অসমর্থ হয়।

হলধর বলিলেন, এরূপ সূত্র কোথায় আছে? স্বামীজি তৎক্ষণাৎ মহাভাষ্য আনাইয়া অং ২। পাদ ১ স্থানে ঐরূপ লিখিত আছে দেখাইয়া দেন। এই কথা শুনিয়া হলধর ওঝা বলিলেন, মহাভাষ্যকার পানিনীও পণ্ডিত ছিলেন এবং আমিও একজন পণ্ডিত, অতএব আমার কথা কি জন্য প্রমাণীয় নহে। একথা শুনিয়া স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন—মহাভাষ্যকার ঋষি পানিনীর তুলনায় আপনি তাঁহার পাদস্থিত ধূলিকণারও তুল্য নহেন। অতএব কৃপা করিয়া এরূপ বাতুলের ন্যায় কথা বলিবেন না। বাস্তবিক এই অহঙ্কারের কথা শুনিয়া অপর পক্ষীয় পণ্ডিতগণও লজ্জিত হইলেন। তৎপরে স্বামিজী বলিলেন, আপনি তো ব্যাকরণকে কাটিয়া ছিঁড়িয়া জোড়া দিবার অধিকার রাখেন, এরূপ গর্ব্ব করিয়া থাকেন, এজন্য জিজ্ঞাসা করি 'কল্মের" সংজ্ঞা কি বলুন? ইহার উত্তর ওঝাজি দিতে না পারায় মৌন হইয়া রহিলেন। তখন স্বামিজী বলিলেন, দেখুন, মহাভাষ্যে "অকথিঞ্চ" এই সূত্রের উপর কল্ম সংজ্ঞা কর্ম্ম বিষয়ক। যাহা হউক সে দিবস রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত এরূপ বিচার চলিল, এবং সকলেই ওঝাজি যে ব্যাকরণে এতদূর কাঁচা, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সে রাত্রে বিচার বন্ধ করিয়া এই সিদ্ধান্ত হইল যে, "সমর্থ পদবিধিঃ" এই সূত্রের যদি সর্ব্বত্র প্রকৃতি হয়, তবে হলধরের জয়, নচেৎ স্বামিজীর জয় ও ইহারই সত্যতা লইয়াই পরদিবস জয়-পরাজয় গণ্য হইবে এই বিষয়ের বিচার স্থিরীকৃত হইল। কোন কোন পণ্ডিত লালা জগন্নাথ প্রসাদের কাছে গিয়া মিথ্যা বুঝাইলেন যে, আগামী কল্যের বিচারে স্বামিজী নিশ্চয় পরাস্ত হইবেন, তজ্জন্ত জগন্নাথ ভীত হইয়া রাত্রিতেই স্বামিজীর কাছে আসিয়া বলিলেন, স্বামিজী আপনি সর্ব্বপ্রকারে জয়ী হইয়াও কিজন্য একটা সূত্রের উপর জয়-পরাজয় স্থিরীকৃত করিলেন? এজন্য আমি আগামী কল্য হলধরের এখানে আসা বন্ধ করিব। স্বামিজী বলিলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি সত্য বলিতেছি, হলধর কোন মতে আমার কথার অন্যথা করিতে পারিবে না, কারণ আমার পক্ষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাও জানিও যে আমি তোমাকে দিব্য দিতেছি তুমি গোহত্যার তুল্য পাতকী হইবে যদি হলধর ও অপরাপর পণ্ডিতকে আগামী কল্য শাস্ত্রার্থ জন্য আনয়ন না কর, বা তাহাতে কোনরূপ বাধা প্রদান কর। যাহা হউক পরদিবস

"সমর্থ পদবিধিঃ" এই সূত্রের উপর ব্যাখ্যা হইল এবং স্বামিজী এরূপভাবে নিজ পক্ষ সমর্থন করিলেন যে সকলেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারই পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অসত্য। তখন হলধর পরাজিত হইয়া হেঁট-মাথা করিয়া রহিলেন। এই পরাজয়ে হলধর এতদূর লজ্জিত হন যে, তাঁহার সেই সভাতেই মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে সকলে সভা হইতে অন্যত্র লইয়া যান। দেবীদাস প্রভৃতি যাহাঁরা হলধরকে কানপুর হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন, তাঁহারা পরাজিত হলধরকে আর ফেরৎ যাইবার পাথেয় পর্য্যন্ত দেন নাই ও বলেন যে, তোমাকে আমরা স্বামী দয়ানন্দকে পরাজয় করিবার জন্য ডাকিয়া ছিলাম, এখন তাহার জয় হওয়ায়, সকলেই মূর্ত্তি পূজা যে অবৈদিক ও অধর্ম্ম কার্য্য ইহা, মানিয়া লইতেছে। তুমি আমাদিগের পক্ষের সর্ব্বনাশ করিলে, সুতরাং তোমাকে পাথেয় বা পুরস্কার আদি কিছুই দিব না। অগত্যা তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে কানপুরে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতে হয়। অবশ্য স্বামিজী পরে এ বিষয় শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হন এবং বলেন, আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিলে,অন্ততঃ লালা জগন্নাথপ্রসাদ দ্বারা উক্ত পণ্ডিতের সম্মান রক্ষা করাইতাম ও তাঁহাকে বিদায়দানের সময় কিছু অর্থাদি প্রদান করাইতাম। কথিত আছে যে, স্বামিজী সর্ব্বাগ্রে ফরক্কাবাদে একটী বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করিবার মনস্থ করেন এবং পান্নালাল প্রভৃতির চেষ্টায় ও উদ্যোগে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্ডিত জ্বালা দত্ত ও আর দুইজন, বিদ্যার্থী হইয়া প্রথমে এই পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন ও তৎপরে স্বামিজী কাশগঞ্জ, ছলেশ্বর, মির্জ্জাপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে এক একটী বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামী দয়ানন্দ ছয়মাস কাল ফরক্কাবাদে থাকিয়া পূর্ণরূপে তথায় বৈদিক ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান করেন। পরে তথা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীশৃঙ্গীরামপুরে উপস্থিত হন এবং তথায় ২।১ দিন অবস্থান করিয়া তথা হইতে জলালাবাদে গমন করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া স্বামিজী এক পতিত উদ্যানে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলে, গয়াপ্রসাদ শুকুল মহাশয় তাঁহাকে বিনয় করিয়া শরণ দাস উদাসীর কুটীরে আনয়ন করেন ও শয়নার্থ শয্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। স্বামিজী সে শয্যা গ্রহণ করেন নাই, মস্তকে একটী ইষ্টক রাখিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দীয় জুন মাসের শেষভাগে স্বামিজী তথা হইতে যাত্রা

করিয়া কাণ্যকুব্জ বা কানৌজ নগরীতে আগমন করতঃ, গঙ্গাতীরে বাস করেন। এখানে হরিশ্চন্দ্র নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার সহিত স্বামিজীর মহাভাষ্যাদি ব্যাকরণ গ্রন্থের বিষয় বিচার হইত। তৎপরে পণ্ডিত গুলজারিলাল ও পণ্ডিত হরিশঙ্কর শাস্ত্রী দুইজনে একত্রিত হইয়া স্বামিজীর সহিত মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে শাস্ত্রার্থ করিয়া পরাস্ত হন ও তজ্জন্য কানৌজ সহরে মহাকোলাহল ও আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং অনেকে মূর্ত্তিপূজা অবৈদিক বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র স্বামিজীর মহাভক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি (স্বামিজী) উক্ত পণ্ডিতজিকে পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশ দেন ও বলেন, যে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সাধনই প্রকৃত সদাচার, নচেৎ প্রতিমা-পূজাদি, সদাচার বাচক নহে। স্বামিজী উপহাসচ্ছলে একদিন পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রকে বলেন যে, পণ্ডিতজী! আপনি আপনার হরিনাম ছাড়িয়া দিউন, কারণ হরি শব্দে দুইটী অর্থ হয়, যথা :—১ম বানর ও দ্বিতীয় চোর। এইজন্য লোকে কৃষ্ণকে উপহাস করিয়া ননীচোর বলিত। এ কথায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। অপর একজন ব্রাহ্মণের নাম গয়াদীন ছিল, স্বামিজী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দীন শব্দে ধর্ম্ম বুঝায় এবং গয়া অর্থে গিয়াছে বা ত্যক্ত হইয়াছে বুঝায়, অতএব গয়াদীন শব্দে যাহার ধর্ম্ম ত্যক্ত হইয়াছে এরূপ বুঝায়। এজন্য উপদেশ দেন যে, আর্য্যগণের এরূপ বিকৃত নাম রাখা কর্ত্তব্য নহে, উত্তমোত্তম নাম রাখা উচিত। কনৌজেও স্বামিজীকে হত্যা করিবার জন্য অনেক দুষ্টলোক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন দুষ্ট গুণ্ডা তাঁহার সম্মুখীন হইলেই ভয়ভীত হইত ও কিছুতেই তথায় দাঁড়াইতে পারিত না। এখানকার নিযুক্ত গুপ্তচরের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল। স্বামিজী কানাকুব্জ হইতে বিটোর পরিদর্শন করিয়া মৌজে মাদারে উপস্থিত হন এবং তথাকার সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্বামিজী তাঁহাদিগের নিকট সামগান শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন যে, সামবেদের মন্ত্রার্থ জ্ঞাত হওয়া সামবেদীর অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি। পরে কানপুরে আসিয়া ভৈরব মন্দিরের নিকট গঙ্গাতটে হরগাহীলাল মহাশয়ের বিশ্রান্তে বাসস্থান নিয়ত করিলেন। তথায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হৃদয়নারায়ণ স্বামীজির আতিথ্যের ভার গ্রহণ করেন। কানপুর সংযুক্ত-প্রান্তের রাজধানী না হইলেও ইহা শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান ও এখানে অনেক ভদ্রলোকের

বাস। বলিতে কি এরূপ বাণিজ্যস্থান সংযুক্তপ্রান্তে আর কোথাও নাই। স্বামিজী এখানে আসিয়া অত্যন্ত প্রবলতার সহিত নিজ সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে শাস্ত্রার্থ জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। তাহাতে ইহাও লেখা ছিল যে,যদি কাহারও কোন বিষয় সন্দেহ থাকে, তবে শঙ্কা সমাধানের জন্য তিনি স্বামীজির নিকট সমাধান করিয়া লইতে পারেন। এই বিজ্ঞাপন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল। "বিশেষতঃ, ইহাতে বেদ ও বেদানুকূল ব্রাহ্মণগ্রন্থ ১১ উপনিষদ, ষড়্দর্শন মনু স্মৃতি মহাভারতাদি ঋষিকৃত গ্রন্থকেই প্রমাণ, তদ্ভিন্ন আধুনিক পুরাণ তন্ত্রাদিকে অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রকাশ করেন। অবতার-বাদ ও মূর্ত্তিপূজা যে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত নহে, তদ্বিষয়ক বিচার ও শাস্ত্রার্থ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া জ্ঞাপন করা হয়। এই বিজ্ঞাপন পাঠে তথাকার পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং সকলে নিজ পক্ষ ও স্বার্থ রক্ষার্থ বদ্ধ-পরিকর হইয়া তথাকার প্রধান পণ্ডিত হলধর ওঝা (যাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে ফরক্কা-বাদে স্বামিজী সর্ব্বতোভাবে পরাস্ত করেন) তাঁহার পুনঃ শরণাপন্ন হইলেন। তখন হলধর ভাবিলেন, যদি এই পণ্ডিতগণের সহায়তার কোনরূপ গণ্ডগোল করিয়াও দয়ানন্দের মুখ বন্ধ করিতে পারি,অথবা ধূর্ত্ততা করিয়া দয়ানন্দকে পরাস্ত করিবার জন্য কোলাহল করিয়াও মান বাঁচাইতে পারি, তবে কতকটা হতমান রক্ষা পায়; নচেৎ দয়ানন্দ স্বামী যখন কানপুরে স্বয়ং উপস্থিত, তখন তাঁহাকে মস্তক উত্তোলন করিতে দিলে আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ স্বামিজী ইতিপূর্ব্বে কানপুরেই কয়েক স্থানে, স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রার্থ করিয়া, প্রতিমা-পূজা খণ্ডন করিয়াছিল ও পণ্ডিতগণ তাঁহার কোনরূপ শাস্ত্রীয় প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হন নাই। কোন কোন স্থানে কোলাহল করিয়া পণ্ডিতগণ সভা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন, পরন্তু তাহাতে লোকে তাঁহাদের প্রতি বড়ই নিন্দাবাদ করিয়াছিল। যাহা হউক, শাস্ত্রার্থের কথাবার্ত্তা স্থিরীকৃত হইল। তৎকালে কানপুরের এসিষ্টেণ্ট কালেক্টার Thanes সাহেব ছিলেন, তাঁহাকে উক্ত শাস্ত্রার্থ কালে লোকে সভার প্রধানস্বরূপ নিয়োজিত করেন। প্রথমতঃ তাঁহার উপস্থিতি কালে কোনরূপ গণ্ডগোল বা মারামারি হইবে না, দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, এজন্য বাস্তবিক কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় হইল, তাহা তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বিচার করিয়া বলিয়া দিবেন। একারণ সন

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৩০ জুলাই তারিখে ভৈরো ঘাটে শাস্ত্রার্থ জন্য দিন স্থির হয়, এবং তথায় প্রায় ২০।২৫ হাজার লোক এই শাস্ত্রার্থ শুনিবার জন্য উপস্থিত হন। সহরের বড় বড় উকিল, ব্যারিষ্টার, মুন্‌সেফাদি সরকারী উচ্চ-পদাদিধারী ব্যক্তি ও অনেক উপস্থিত ছিলেন। থেন্স সাহেব সভাপতির আসনে আসীন হন। সভা আরম্ভের পরে শাস্ত্রার্থের প্রারম্ভে, হলধর ওঝা বলিলেন যে স্বামীজি যে সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অনেক অশুদ্ধি আছে। স্বামীজি বলিলেন, ব্যাকরণের শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার পাঠশালার ছাত্রদিগের কার্য্য, এখানে আমরা সিদ্ধান্ত বিষয় নির্ণয়ার্থে আসিয়াছি,এজন্য ব্যাকরণ বিষয়ক শুদ্ধাশুদ্ধির কুতর্ক আনিবেন না। আর যদি বাস্তবিকই কোন শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয় আপনার শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে, কৃপাপূর্ব্বক অন্য দিবস আসিবেন, আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিব যে আমার বিজ্ঞাপনে কোন অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। তখন ওঝাজি দেখিলেন, বাজে কথায় শাস্ত্রার্থ চলিবে না, কাজেই জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি মহাভারতকে প্রমাণীয় গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন কি না? স্বামীজি বলিলেন হাঁ স্বীকার করি। তখন ওঝাজী মহাভারতের একশ্লোক উল্লেখ করেন, যাহাতে একজন ভীল জাতীয় যুবক, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ও তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া, ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিল। ইহাতে অনুমিত হয় যে, সে দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তি-পূজা করিয়া বাণ-বিদ্যা শিক্ষা করিত।

স্বামীজি তদ্দুত্তরে বলিলেন, আমি মূর্ত্তি পূজার বিধান ও শাস্ত্রীয় আজ্ঞার বিষয় কোথায় লিখিত আছে, জানিতে চাহি। এই শ্লোকে মূর্ত্তিপূজার বিধি বিষয়ক কোন আজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে না; বরং ইহাই প্রমাণীত হইতেছে যে, ভীল অজ্ঞানী পুরুষ, এবং যেরূপ এখনও বন্য জাতীয় লোকেরা অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিমাদি পূজন করে, তদ্রূপ সেই ভীলও, তাহাদের জাতীয় প্রথানুসারে দ্রোণাচার্য্য—যিনি একজন মহাধনুর্ধর ছিলেন—তাঁহার মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া নিজ অভ্যাস বলে ও ধনুর্ব্বাণ বিষয়ক চাঁদমারি করিয়া, নিজেই ধনুর্ব্বিদ্যা অনেকটা অভ্যাস করিয়াছিল। সে কেবল ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া আপনা আপনি গুরুদেবের কৃপায় ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে নাই; অথবা দ্রোণ-মূর্ত্তি তাহাকে ধনুর্ব্বেদ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, এরূপ কোন কথা মহাভারতে লিখিত নাই। তখন ওঝা নিরস্ত হইয়া কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন; স্বীকার

করি, বেদাদি-শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধান বা আজ্ঞা নাই; পরন্তু কোথাও কি কোন নিষেধ বাক্য পাওয়া যায়? স্বামিজী বলিলেন যে, যদিচ বেদ-শাস্ত্রে "নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্যনাম মহদ্‌যশঃ"। বা "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" আদি প্রমাণ লিখিত আছে, পরন্তু যদি কোন লোক তাহার সেবককে বলেন যে, তুমি এই পত্র লইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাও, তজ্জন্য কি অপর দিকে যাইও না একথা না বলা সত্ত্বেও অন্য দিকে যাইবার নিষেধ হয় না? এবং যদি সেই ভৃত্য বলে, আমি কি তবে অন্য দিকে যাইব না, তাহা যেরূপ ব্যর্থ হয়, সেইরূপ যেখানে বেদে যে বিষয় উচিত বুঝিয়াছেন তাহারই প্রতিপাদন করিয়াছেন ও অন্য সমগ্র নিষেধবাচক জানিতে ও বুঝিতে হইবে। তৎপরে থেল্স সাহেব মনে করিলেন যে, স্বামী দয়ানন্দ কৌপীনধারী সন্ন্যাসী; ইনি কেবল যুক্তিদ্বারা তর্ক করিতেছেন কি বাস্তবিক লেখাপড়া জানেন, এই পরীক্ষার্থে যে পত্র হলধর ওঝার নিকট ছিল, তাহা লইয়া স্বামীজিকে পড়িতে বলায়, স্বামীজি তাহা পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি যদি মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করেন, তবে কাহাকে মানেন? স্বামীজি বলিলেন এক সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমি স্বীকার করি। এই কথায় তখন সাহেব টুপী খুলিয়া স্বামীজিকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ওঝাজীর পক্ষের লোকেরা দেখিল আর মান বাঁচান ভার, কাজেই তখন তাহারা কোলাহল করিয়া দয়ানন্দ হারিয়া গেলেন, এবং জয় হলধর ওঝার জয়, জয় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর জয় বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। পরন্তু সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে স্বামীজির পক্ষই সত্য ও স্বামীজিরই জয় হইয়াছে। পর দিবস প্রতিবাদীগণ, অর্থ ব্যয় করিয়া স্বামী দয়ানন্দ পরাজিত ও হলধরঝা জয়ী হইয়াছেন, এইরূপ মিথ্যা সংবাদ মুদ্রিত করিলেন। পরন্তু ইহাতে কিছুই ফল না হইয়া বরং বিপরীতই ঘটিল। কারণ প্রায় সমস্ত লোকেই জানিতে পারিলেন যে দয়ানন্দ স্বামীর বাস্তবিক জয় হইয়াছে এবং তাঁহার পক্ষই সত্য, তজ্জন্য অনেকেই তৎকালে বিষ্ণুশিলা ও নর্ম্মদেশ্বর শিলা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপন পাঠেই, পাঠক অবগত হইবেন যে, তথাকার প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ঘটিয়াছিল—"যেহেতু দেখা যাইতেছে যে দয়ানন্দ সরস্বতীর মতানুসারে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আদিগণ নিজ

কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবতাগণের মূর্ত্তিকে গঙ্গা প্রবাহে প্রবাহিত করিতেছেন ও এই কার্য্য অত্যন্ত অনুচিত হইতেছে ; এজন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, যে সকল লোক দয়ানন্দের মত স্বীকার করিয়া মূর্ত্ত্যাদি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে চাহেন, তাহারা যেন কৃপা করিয়া উক্ত দেব-মূর্ত্তিগুলি মহারাজ গুরুপ্রসাদ ও মহারাজ প্রয়াগনারায়ণ তেওয়ারী জীর মন্দিরে পৌঁছাইয়া দেন। যদি একান্ত কেহ পৌঁছাইয়া দিতে অস্বীকৃত হন তবে, আমাদিগকে জানাইলে, আমরা এরূপ লোকের বাটী গিয়া তাহা লইয়া আসিতে পারি। বলা বাহুল্য এরূপে দেবমূর্ত্তিকে জলে নিক্ষেপ করা মহান্ পাপ কার্য্য।" (স্বাক্ষর) হলধরওঝা।

উপরোক্ত বিজ্ঞাপন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাস্তবিক কানপুরে সে সময় জনসাধারণের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল ও বাস্তবিক দয়ানন্দের জয় হইয়াছিল কি না ?

তৎপরে যখন মূর্ত্তিপূজকগণ দয়ানন্দ স্বামী হারিয়া গিয়াছেন এই মিথ্যা রব রটাইবার চেষ্টা করিয়া অনর্থক কোলাহল করিতে লাগিলেন তখন গুটীকতক ভদ্রলোক থেন্স সাহেবের নিকট গিয়া বলেন, আপনি উক্ত শাস্ত্রার্থে মধ্যস্থ ছিলেন, এজন্য আপনি কৃপা করিয়া উক্ত শাস্ত্রার্থ বিষয়ে নিজ মত লিখিয়া দেউন, আমরা তাহা মুদ্রিত করিব। ইহাতে নিম্নলিখিত পত্রটী থেন্স সাহেব লিখিয়া দেন। যথা :—

Gentlemen ! At the time in question, I decided in favor of Dayanand Saraswatty Fakir (Sanyasee). I think he won the day. If you wish I will give you my reasons for my decision, in a few days.

(Sd) Thanes.

অর্থাৎ ভদ্র মহোদয়গণ ! শাস্ত্রার্থ সময় আমি স্বামী দয়ানন্দ ফকিরের (সন্ন্যাসীর) সাপক্ষে নিজ মত প্রকাশ করি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, সে দিবস দয়ানন্দেরই জয় হইয়াছে ; যেহেতু তাঁহার সমস্ত যুক্তিগুলি বেদানুকুল ছিল। আমার মতে তিনি সে দিবস বিজয়ী হইয়াছেন। যদি আপনারা আমার এই বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি তাহা পশ্চাতে প্রকাশ করিতে পারি। (হস্তাক্ষর) থেন্স

স্বামীজি কানপুরে বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়া পরে প্রয়াগ রাজধানীতে

আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। মাধোপ্রসাদ নামক তথাকার এক যুবক, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও তৎসঙ্গে ইহাও প্রচার করেন যে, যদি কোন হিন্দুপণ্ডিত তাঁহাকে তিন মাস মধ্যে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে,তাঁহার ধর্ম্ম,খৃষ্টান ধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল,অথবা অন্ততঃ মন্দ নহে তবে,এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কথিত আছে অনেকগুলি পণ্ডিত তাঁহার নিকট গিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, পরন্তু প্রায় সকলেই পিতা মাতার ধর্ম্ম মন্দ হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ইত্যাদি, বাজে কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহই প্রকৃত তর্ক ও যুক্তি প্রদান করেন নাই। ইহাতে তিনি বলেন যে, তাহা হইলে চোরের ঘরের ছেলের চুরি করা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মানিতে হইবে। যাহা হউক সে সময় স্বামীজি হঠাৎ এলাহাবাদে উপস্থিত হওয়ায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম কি? এবং তাহার সত্য সিদ্ধান্ত বা কিরূপ? তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে তুমি খৃষ্টান ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে এমন একটী নূতন কথা বাহির কর যাহা বহুকাল পূর্ব্বে, বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদাদিতে প্রকাশিত হয় নাই, এবং তাহাও উহা অপেক্ষা উন্নত ও উচ্চতর ভাবে লিখিত হয় নাই। বলা বাহুল্য ঐ যুবক স্বামীজির উপদেশে বৈদিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

প্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া গাজিপুর আদি স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে, স্বামীজি রামনগর রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তথা হইতে গঙ্গা পার হইয়া দুর্গাকুণ্ডের নিকট বিজয় নগরের রাজার রাজবাটীতে অবস্থান করেন। সকলেই অবগত আছেন যে কাশীধাম চলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গড় বা দুর্গস্বরূপ। এখানে ভারতবর্ষের সকল স্থানের পণ্ডিতগণ বাস করেন। এই স্থানে মরিলে বিনা চেষ্টায় স্বর্গলাভ হয়, এই মিথ্যা সংস্কার ও বিশ্বাসে, অনেক লোক বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীগণ এইস্থানে বাস করেন। কথিত আছে কাশীতে থাকা কালীন এক দিবস মহারাজা ভরতপুর মহারাজা রীওয়াঁ ও মহারাজা নরওয়াঁ এক ইংরাজকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করতঃ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা নাস্তিক বাদ সমর্থন করেন। স্বামীজি তাঁহাদিগকে এরূপ যুক্তি

তর্ক ও প্রমাণ সহকারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মানবের যে ঈশ্বরোপাসনা করা কর্ত্তব্য তাহা, সম্যক বুঝাইয়া দেন, যাহা শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া প্রত্যাগমন করেন।

দয়ানন্দ স্বামী কাশীধামে আসিয়া ডঙ্কা মারিয়া মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথমে কতিপয় পণ্ডিত স্বামীজির সম্মুখীন হন,পরন্তু সামান্য শাস্ত্রার্থেই পরাজিত হওয়ায় তাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত যথা বালশাস্ত্রী সীতারাম শাস্ত্রী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী আদি কাশীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট গিয়া বলেন যে, আর কাশীর মান রাখা দায়, দয়ানন্দ নামক এক সন্ন্যাসী আসিয়া কাশীর বাবা বিশ্বেশ্বরের পর্য্যন্তও খণ্ডন করিতেছে। কেহ তাহার সম্মুখে শাস্ত্রার্থ করিতে পারিতেছে না। সে যেরূপ ব্যাকরণে মহান্ পণ্ডিত, তদ্রূপ বেদ ও অপরাপর সর্ব্বশাস্ত্রে বুৎপন্ন। তাহার কাছে কোন গ্রন্থ অবিদিত নাই। তাঁহাকে সম্মুখ ও ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করা অসম্ভব,এজন্য কৌশলে পরাস্ত করিয়া কাশীর মান রক্ষা করিতে হইবে। এই কথার বালশাস্ত্রী আদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া,কাশীরাজের নিকট গিয়া বলিলেন,আপনি দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর! কাশীর প্রতিষ্ঠা আপনার সহিত ও আপনার প্রতিষ্ঠা কাশীর সহিত সমবায় সম্বন্ধ স্বরূপ। এজন্য দয়ানন্দকে যেন তেন প্রকারেণ পরাজিত করিতেই হইবে। কাশী-নরেশ, দয়ানন্দ স্বামী প্রথমে রামনগর আসিয়া তাঁহার কোন কাশীস্থ বাটীতে অবস্থান না করিয়া বিজয় নগরের রাজবাটীতে অবস্থান করিতেছেন, একারণ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতে অসন্তুষ্ট ছিলেন,তাহাতে পণ্ডিতেরা এরূপ বলায় যাহাতে দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্রার্থ হয়,তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, আমি নিজেই সভাপতির কার্য্য করিব। শাস্ত্রাস্ত্রের দিবস ও স্থান নির্দ্ধারিত হইল, এবং সন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই নবেম্বর তারিখে অর্থাৎ সম্বদ ১৯২৬ বিক্রমাব্দীয় কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী মঙ্গলবারে এই মহান্ শাস্ত্রার্থের দিবস স্থিরীকৃত হইল। চারিদিক হইতে দর্শক ও পণ্ডিতগণ সমাগত হইতে লাগিলেন কাশীতে এক মহান আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রায় ৫০।৬০ হাজার লোক তথায় একত্রিত হন। যদিচ সহরের কোতওয়াল মহাশয় শাস্ত্রার্থে উভয় পক্ষের লোকের বসিবার স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন তথাপি, স্বার্থী পণ্ডিতগণ প্রথম হইতেই সভাস্থলে ঢুকিয়া প্রায়

সমস্ত স্থানগুলি অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে স্বামীজির পক্ষীয় তিন জন লোক এক পত্র দ্বারা স্বামীজিকে জ্ঞাত করিলেন যে তাহাদিগকে দ্বারী ও পুলিশ ভিতরে ঢুকিতে দিতেছে না। তখন স্বামিজী কোতওয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার পক্ষে মোটে ৩।৪ জন আসিয়াছেন, তাহাদিগকেও কি জন্য সভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে? এ কথা শুনিয়া কোতওয়াল লজ্জিত হইল এবং তখন দ্বারদেশ হইতে এক বৃদ্ধ পরমহংস ও পণ্ডিত জাহর দাস তথা পণ্ডিত জ্যোতিঃস্বরূপকে সঙ্গে আনিয়া স্বামীজির সমীপে বসাইলেন। পণ্ডিত জ্যোতিঃস্বরূপকে দেখিবামাত্র কাশীর পণ্ডিতগণ চকিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে স্বামী দয়ানন্দ একাই সিংহ-স্বরূপ, তাহাতে যদি জ্যোতিঃস্বরূপ আসিয়া সমবেত হন তবে, সিংহ ও ব্যাঘ্র একত্রিত হইলে বনের ইতর জন্তুগণ তৎসমক্ষে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে। বিশেষতঃ জ্যোতিঃস্বরূপ সভাতেই বলিয়া উঠিলেন যে স্বামিজীর সহিত পরে শাস্ত্রার্থ হইবে প্রথমে যদি কেহ আমাকে পরাস্ত করিতে পারেন তবে স্বামিজীর সহিত তর্ক হইবে।

যখন কাশীনরেশ আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন তখন পণ্ডিতগণ সকলে দাঁড়াইয়া কোলাহল করতঃ, মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এক-জন পণ্ডিত তাঁহাকে বলিলেন যে, দয়ানন্দ একাই সিংহস্বরূপ; তৎপরে যদি ব্যাঘ্র সদৃশ জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করে, তবে নিশ্চয় উহারা অজেয় হইবে সন্দেহ নাই; এ কারণ জ্যোতিঃস্বরূপকে স্বামী দয়ানন্দের নিকট হইতে সরান কর্ত্তব্য। তখন কাশীনরেশ জ্যোতিঃস্বরূপকে বলিলেন এই স্থান শাস্ত্রার্থের পণ্ডিতগণ জন্য নিয়ত করা হইয়াছে, এজন্য আপনি অপর স্থানে উপবেশন করুন। তখন তিনি (জ্যোতিঃস্বরূপ) কিছু সরিয়া বসিলেন। পরন্তু তাহাতেও কাশীনরেশের মন হইতে আশঙ্কা দূরীভূত হইল না। তিনি তৎপরে তাঁহাকে তথা হইতেও উঠাইয়া অপর স্থানে বসিবার আদেশ দিলেন। আদেশ অবশ্য পালিত হইল, পরন্তু দয়ানন্দস্বামী তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে আমার পক্ষের লোক মোটে ২।৪ জন, তাঁহাদিগকে ও আমার নিকট হইতে কি জন্য অন্যত্র সরান হইতেছে? ইহাতে কাশীনরেশ বলিলেন—শাস্ত্রার্থ ত' আপনি একা করিবেন, পণ্ডিতেরা একের পর অপরে আপনার সহিত তর্ক

করিবেন। দয়ানন্দ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে এ স্থলে অন্যায় ও স্বার্থ-পরতার কার্য্য হইতেছে। তিনি কোতয়ালের দিকে দৃষ্টি করিলেন, কোতয়াল বলিলেন আমি ঠিক সরঞ্জাম করিয়াছিলাম, কাশীর রাজার সম্মুখে এই অন্যায় আজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে চক্ষুলজ্জা বোধ হয়, এজন্য অসমর্থ। যাহা হউক আমার প্রধান কার্য্য শান্তিরক্ষা করা, তাহাতে যদি কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে তখন আমি কাহাকেও মানিব না এবং নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিব।

স্বামী দয়ানন্দ পাছে বেশী জেদ করিলে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থ না করেন ও আরও বোধ হয় ভাবিলেন যে এক সূর্য্যের সম্মুখে অসংখ্য খদ্যোৎ বা জোনাকি পোকা কি করিতে পারে? এজন্য স্থিরভাবে অটল ও অচল স্থাণুর ন্যায় নির্ভীক চিত্তে বসিয়া রহিলেন। তৎসময়ের দৃশ্য এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় হইয়াছিল। এক দিকে কাশীরাজ রাজবেশে ভূষিত ও তৎসহ তারানাথ তর্করত্ন সভাপণ্ডিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বালশাস্ত্রী, পণ্ডিত শিবসহায় শর্ম্মা, মাধবাচার্য্য, বামনাচার্য্য, দেবীদত্ত শর্ম্মা, স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত আদি প্রায় ৩০জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সমবেত ও অপরদিকে হিমাচল পর্ব্বতের সদৃশ স্থিরচিত্ত গম্ভীর ও শান্ত মূর্ত্তি স্বামী দয়ানন্দ একাকী নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য সভা-মণ্ডপে করিযূথ পরিবেষ্টিত মহাপরাক্রান্ত কেশরীর ন্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার মুখের হাস্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। কাশীনরেশ স্বয়ং সভাপতির আসনে আসীন হইলেন। স্বামীজি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিতগণ কি বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র আনয়ন করিয়াছেন? কাশীপতি উত্তর দিলেন আমার কাশীস্থ পণ্ডিতের সমগ্র বেদ ও শাস্ত্র কণ্ঠস্থ আছে, এজন্য পুস্তকের প্রয়োজন কি?

তৎপরে স্বামীজি সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোন বিষয় বিচার আরম্ভ হইবে? পণ্ডিতগণ তদুত্তরে বলিলেন, আপনি মূর্ত্তি পূজার খণ্ডন করিবেন এবং আমরা তাহার মণ্ডন করিব। স্বামীজি বলিলেন ক্ষতি নাই তাহাই হইবে; পরন্তু, সভাপতি মহাশয় যেন এই বিষয় নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যে, আমার সঙ্গে যে কেহ পণ্ডিত বা স্বামী যখন বিচার করিবেন তখন যেন তিনি একাকী আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। পরে তিনি যখন পরাজিত হইবেন, অথবা অন্য কোন কারণে আর বলিতে বা বিচারে অনিচ্ছুক হইবেন তখন,

তৎস্থানে অপর পণ্ডিত, আসীন হইয়া বিচার করিবেন ; অচেৎ একজালে সকলে প্রশ্ন বা উত্তর করিলে একাকী তাহার উত্তর দেওয়া কিরূপে সম্ভবে। এ বিষয় কোতওয়ালও সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন যে,এরূপ না করিলে শান্তিরক্ষা করা সুকঠিন। স্বামীজি বলিলেন আমার মতে পাষাণ বা মূর্ত্তিপূজা অবৈধ। এজন্য সমাগত পণ্ডিতগণ যদি মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে,কোন বৈদিক প্রমাণ থাকে, কৃপা পূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন। এ কথায় অপর পক্ষীয় পণ্ডিতেরা তর্ক তুলিলেন বৈদিক প্রমাণ কাহাকে বলে তাহার সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক। দয়ানন্দ তদুত্তরে বলিলেন স্বয়ং বেদের মন্ত্রভাগ স্বতঃপ্রমাণ এবং ব্রাহ্মণাদি বেদাঙ্গসকল পরতঃ প্রমাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে মনুসংহিতা ছাড়া অপর ১৯টী ধর্ম্মশাস্ত্র ঋষি প্রণীত নহে। অপিচ মনুসংহিতাতেও যে সকল প্রক্ষিপ্তাংশ আছে তাহাও পরিত্যাজ্য। পণ্ডিত তারাচরণ বলিলেন,মনুসংহিতা যে বেদমূলক তাহার প্রমাণ কি ? স্বামিজী তদুত্তরে বলিলেন ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে কথিত আছে যাহা কিছু মনু বলিয়াছেন তাহা ঔষধি সদৃশ ও গ্রাহ্য। তৎপরে বাজে তর্ক বিতর্কের পর স্বামিজী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ধর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ কি ? বিশুদ্ধানন্দ তাহার উত্তর দিতে না পারায়, তিনি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি বলুন ধর্ম্মের লক্ষণ কি ? তখন স্বামীজী মনুসংহিতার লিখিত "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধং দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং।" অর্থাৎ ধৃতি বা ধৈর্য্য, ক্ষমা অর্থাৎ প্রতিশোধ দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্বেও কাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা, মন নিগ্রহ,অস্তেয় বা অচৌর্য্য বৃত্তিসাধন, আন্তরিক ও বাহ্যিক শুদ্ধাচরণ, দশেন্দ্রিয় দমন, ধী বা সুবুদ্ধি, বিদ্যা, অর্থাৎ যে পদার্থ যেরূপ তাঁহাকে তদ্রূপ জানা, সত্যাচারী সত্যবাদী ও সত্যমানী হওয়া, এবং অক্রোধ অর্থাৎ অহিংসা বা সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশ করা—এই দশ প্রকার ধর্ম্মের লক্ষণ।

বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মহাশয় অত্যন্ত নিগ্রহ স্থানে পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া, কাশীর প্রধান পণ্ডিত বালশাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহার রক্ষার্থ সর্ব্বাশ্রিত পণ্ডিত হইয়া স্বামীজিকে বলিলেন, "আমি সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি অতএব যে গ্রন্থে ইচ্ছা হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা হউক"। তখন স্বামীজি বালশাস্ত্রীকে অধর্ম্মের লক্ষণ কি ? এই প্রশ্ন করিলেন। কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহারথী বালশাস্ত্রী এই সামান্য প্রশ্নের উত্তরে অসমর্থ হইয়া মৌন ধারণ করিলেন। তখন পণ্ডিতেরা